WaterAid

Network for Information, Response And Preparedness Activities on Disaster
nirapad

হ্যান্ডবুক
জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগসহিষ্ণু পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা

হ্যান্ডবুক

জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগসহিষ্ণু পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা

WaterAid

Network for Information, Response And Preparedness Activities on Disaster
nirapad

হ্যান্ডবুক:
জলবায়ু পরিবর্তন এবং
দুর্যোগসহিষ্ণু পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা

প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০১২

স্বত্ব: ওয়াটারএইড ইন বাংলাদেশ

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৫১৪৭-৩

সার্বিক তত্ত্বাবধান
কাজী সাহিদুর রহমান
আরিফ আব্দুল্লাহ খান
হাসিনা আক্তার মিতা

গবেষণা ও সম্পাদনা
জাহিদ হোসেন
ড. শেখ তৌহিদুল ইসলাম
মো: রুহুল আমীন
সাব্বির হোসেন
সাফিনা নাজনীন
এস. এম. শিহাবুল ইসলাম
মেহেদী হাসান শিশির

আলোকচিত্র
জাহিদ হোসেন
ড. শেখ তৌহিদুল ইসলাম

ডিজাইন ও প্রিন্ট
অর্ক

প্রাক-কথন

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, অবস্থান ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে মানুষের সম্পদ ও পরিসেবার প্রচুর ক্ষতি হয়ে থাকে যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করার মাধ্যমে তাদেরকে এক ভয়াবহ দুর্দশার মধ্যে ফেলে দেয়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন রকম প্রভাবের কারণে তাদের এই দুর্দশার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধরা হয়ে থাকে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাব যে সকল দেশে ইতোমধ্যে পড়া শুরু হয়েছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। দুর্যোগের কারণে যে সকল অবকাঠামোর ক্ষতি হয় তার মধ্যে পানি ও স্যানিটেশন অবকাঠামো বা সরবরাহ ব্যবস্থাগুলো অন্যতম। দেখা যায় বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসে কোন এলাকার টিউবওয়েলগুলো সব পানিতে তলিয়ে যায় কিংবা বন্যার পানিতে টিউবওয়েল বা পুকুরের পানি দূষিত হয়ে পড়ে যার ফলে মানুষ অনিরাপদ পানি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বেশিরভাগ ল্যাট্রিন দুর্বল ও নিচুভাবে তৈরি হওয়ায় এগুলো খুব সহজেই ভেঙ্গে পড়ে। এতে জনসাধারণ খোলা জায়গায় পয়ঃনিষ্কাশন করতে বাধ্য হয়। পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার এই সংকট সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিচর্চা সম্পূর্ণ ব্যাহত করে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পানি ও বায়ুবাহিত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলাঞ্চলে লবণাক্ততার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে বিনষ্ট হচ্ছে নিরাপদ পানির আধারগুলো, আর এতে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যায়। নিরাপদ পানির জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

ওয়াটারএইড একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা যারা বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা প্রর্বতনে কাজ করে। দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার বিভিন্ন নিত্য নতুন প্রযুক্তিগুলোকে কিভাবে আরো কার্যকর ব্যবস্থাপনায় আনা যায় ও তা কিভাবে আরো ছড়িয়ে দেয়া যায় তা নিয়ে ওয়াটারএইড কাজ করছে। "জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগসহিষ্ণু পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা" শীর্ষক হ্যান্ডবুকটি প্রণয়ন করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকিজনিত পরিস্থিতিতে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য। এটি মূলত প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহার করা হবে। হ্যান্ডবুকটি মাঠ পর্যায়ের কর্মীদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগঝুঁকির প্রেক্ষাপটে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা সম্পর্কিত বাস্তব ধারণা দেবে এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জোগাবে। এক্ষেত্রে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিশ্চয়তা মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ওয়াটারএইড- "জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগসহিষ্ণু পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা" শীর্ষক এই হ্যান্ডবুকটি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারের পরিকল্পনা করেছে।

মোঃ খায়রুল ইসলাম
কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, ওয়াটারএইড ইন বাংলাদেশ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও এর ফলে দেশে ক্রমবর্ধমান দুর্যোগের কথা বিবেচনায় রেখে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চাকে কিভাবে আরো সহিষ্ণু ও টেকসই করা যায় সে লক্ষ্যে "জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগসহিষ্ণু পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা" শীর্ষক হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নে নিরাপদ'কে সম্পৃক্ত করার জন্য আমরা ওয়াটারএইড ইন বাংলাদেশকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। হ্যান্ডবুকটি তৈরির সময় প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সার্বিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আরিফ আব্দুল্লাহ খান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ওয়াটারএইড ইন বাংলাদেশ ও তার সাথে আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওয়াটারএইড ইন বাংলাদেশ এর প্রোগ্রাম অফিসার (সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট) মাহফুজুর রহমান ও সাফিনা নাজনীনকে। হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদানের জন্য আমাদের কনসালটেন্ট জাহিদ হোসেন, ড. শেখ তৌহিদুল ইসলাম এবং মোঃ রুহুল আমীনকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নের সময় বিভিন্ন তথ্য ও মূল্যবান মতামত প্রদানের মাধ্যমে একে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রদীপন এর প্রেসিডেন্ট ফেরদৌসুর রহমানের কাছে নিরাপদ কৃতজ্ঞ। হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ওয়াটারএইড ইন বাংলাদেশের পার্টনার এনজিওগুলোর মাঠপর্যায়ের কর্মীদের নিয়ে 'রাইটশপ ওয়ার্কশপ' আয়োজনে সার্বিক সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রূপান্তর, সুশীলন ও ইউএসটি এর প্রতি। হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নের সময় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার মডিউল, গবেষণাপত্র, হ্যান্ডবুক এবং প্রকাশনার সহযোগিতা নেয়া হয়েছে, এই সংস্থাগুলোর প্রতিও আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বোপরি আমরা কৃতজ্ঞ ওয়াটারএইড ইন বাংলাদেশ এর পার্টনার এনজিওগুলোর প্রশিক্ষকদের প্রতি এবং এর সাথে সাথে স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি যারা শেষ পর্যন্ত এই হ্যান্ডবুকটি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করবেন।

কাজী সাহিদুর রহমান
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, নিরাপদ

সূচীপত্র

প্রাক-কথন ০৩
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ০৪
হ্যান্ডবুকের উদ্দেশ্য, পরিধি ও কাঠামো ০৭

প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশের দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ০৯
১.১. দুর্যোগ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা ০৯
১.২. জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়: পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা ১৭
২.১. নিরাপদ পানি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা ১৭
২.২. স্যানিটেশন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা ১৯
২.৩. স্বাস্থ্যবিধিচর্চা বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা ২১

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা বিষয়ে পরিবর্তনজনিত উদ্বেগ ২৭
৩.১. উপকূলীয় অঞ্চল ২৭
৩.২. নদী অববাহিকা ও চর অঞ্চল ২৮
৩.৩. পার্বত্য অঞ্চল ৩০
৩.৪. হাওর অঞ্চল ৩১
৩.৫. বরেন্দ্রভূমি ও মধুপুর অঞ্চল ৩২

চতুর্থ অধ্যায়: পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধিচর্চার উপর দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ৩৫
৪.১. পরিবেশগত ৩৫
৪.১.১. লবণদূষণ ৩৬
৪.১.২. মরুময়তা ৩৬
৪.১.৩. বর্ধমান আপদপ্রবণতা ৩৬
৪.১.৪. জলাবদ্ধতা ৩৭
৪.২. সামাজিক প্রভাব ৩৭
৪.২.১ বঞ্চনা ৩৮
৪.২.২. বৈষম্য ৩৯
৪.২.৩. দুর্ভোগ ৩৯
৪.২.৪. স্থানচ্যুতি ৪০

৪.৩. স্বাস্থ্যগত ৪০
৪.৩.১. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ৪০
৪.৩.২. জনস্বাস্থ্য ৪০
৪.৩.৩. প্রজনন স্বাস্থ্য ৪২

পঞ্চম অধ্যায়: দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিশ্চয়তায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয় ৪৩
৫.১. পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা বিষয়ে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ৪৩
৫.১.১. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের দায়িত্ব ও অংশগ্রহণ ৪৪
৫.১.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ৪৫
৫.২ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কৌশল ৪৮
৫.২.১. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিশ্চয়তা ব্যবস্থাপনা কৌশল ৪৮
৫.২.২. অনিশ্চয়তা ব্যবস্থাপনার মূলনীতি ৫১
৫.২.৩. পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা বিষয়ে বিবেচ্য ৫২
৫.২.৪. সম্পদ সমাবেশ ৫৩
৫.৩. জবাবদিহিতা ৫৪
৫.৩.১. জবাবদিহিতা কাঠামো ৫৫

পরিশিষ্ট: পরিভাষা ৫৭

গ্রন্থপঞ্জী ৬৫

হ্যান্ডবুকের উদ্দেশ্য, পরিধি ও কাঠামো

“জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগসহিষ্ণু পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা” শীর্ষক হ্যান্ডবুকটি রচনা করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকিজনিত পরিস্থিতিতে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য। এটি মূলত প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহার করা হবে। হ্যান্ডবুকটি মাঠ পর্যায়ের কর্মীদেরকে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগঝুঁকির প্রেক্ষাপটে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা সম্পর্কিত বাস্তব ধারণা দেবে এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জোগাবে।

হ্যান্ডবুকটির প্রধান বিষয় হলো নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা। তাই, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগঝুঁকির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়, যেমন, জীবিকায়ন এতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। তাছাড়া, হ্যান্ডবুকটি প্রধানত ইউনিয়ন তথা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে রচনা করা হয়েছে। এখানে দেশের গ্রামীণ পরিবেশে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার সার্বিক চিত্র, সমস্যা ও এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। দেশের নগরাঞ্চলের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো এই আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগঝুঁকি সংক্রান্ত অনেক সমীক্ষা, প্রতিপাদ্য ও তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সঙ্গত কারণেই সংশ্লিষ্ট মহলে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা ও মতপার্থক্য রয়েছে। এই হ্যান্ডবুকে এসব বিষয় আলোচনাকালে মীমাংসামূলক বিশ্লেষণের অবতারণা করা হয়নি। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ সরকারের প্রামাণ্য দলিল ও আইপিসিসি কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ্য তথ্য-উপাত্ত ও প্রতিপাদ্য ব্যবহার করা হয়েছে। উপরন্তু, প্রশিক্ষণের অভীষ্ট অংশগ্রহণকারীদের কর্মপরিধি ও তাদের গ্রহণ ক্ষমতা বিবেচনা করে হ্যান্ডবুকটি প্রাঞ্জল ও ব্যবহারোপযোগী করার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগঝুঁকি সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় উপস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য সরলীকরণ করা হয়েছে; যেমন- বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বিষয়ে ব্যাখ্যা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগঝুঁকির পারস্পরিক প্রভাব ও ভৌগোলিক পরিবেশ ভেদে বাংলাদেশে অঞ্চল ভিত্তিক বিভক্তি। হ্যান্ডবুকে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ এখানে দুর্যোগঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য হলো বাংলাদেশ একটা দুর্যোগপ্রবণ দেশ ও দুর্যোগের কারণে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়; আর জলবায়ু পরিবর্তন ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে ও দুর্যোগের প্রচণ্ডতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ এককভাবে ও সম্মিলিতভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার কাঠামোর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ এই অধ্যায়ে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কিত সেবা বর্তমানে মানবাধিকার হিসাবে স্বীকৃত; তবে এগুলো মূলত জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার সাথে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ কিভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চায় বিঘ্ন ঘটায় তা এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ এখানে আলোচনা করা হয়েছে অঞ্চলভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগঝুঁকির ভিন্নতা ও তা কিভাবে পানির প্রাকৃতিক উৎস ও প্রচলিত প্রযুক্তি অকেজো করে ফেলছে এবং নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ এই অধ্যায়ের আলোচনার মূল বিষয় হলো জলবায়ু ও দুর্যোগ কিভাবে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে এবং কিভাবে তা নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি করছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ এখানে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান জাতীয় নীতিগত কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগঝুঁকিজনিত অনিশ্চয়তা মোকাবেলা করার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণে মূলনীতি ও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়:
বাংলাদেশের দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন

ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের কারণে বাংলাদেশ অতিমাত্রায় দুর্যোগপ্রবণ।[১] তাছাড়া, অধিক জনঘনত্ব ও ব্যাপক দারিদ্রের কারণে জনসংখ্যার বড় অংশ প্রান্তিক এলাকায় বসবাস করে। এদের দুর্যোগ বিপদাপন্নতা অনেক বেশি। ফলে, ঝড়, বন্যা বা নদীভাঙ্গনের মতো আপদের কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় ও জনগোষ্ঠী নিদারুণ দুর্দশায় ভোগে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে একদিকে আবহাওয়া জনিত আপদের পৌনঃপুনিকতা ও প্রচন্ডতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি বাড়ে। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন সরাসরি জনগোষ্ঠীর জীবিকার বিপর্যয় ঘটায় ও তাদেরকে আরো বেশি বিপদাপন্ন করে তোলে।

উপরন্তু, বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে- ঋতুচক্র ও আবহাওয়ায় অস্বাভাবিক হেরফের দেখা দিচ্ছে।[২] এর কারণে, জনগোষ্ঠীর জীবিকার সুযোগ সংকুচিত ও জীবনযাত্রা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এভাবে একদিকে জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা বাড়ছে; অন্যদিকে ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যা ও নদীভাঙ্গনের মত আপদ পৌনঃপুনিক ও তীব্র হয়ে উঠছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির কারণে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

দুর্যোগ সমাজ বা জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় এমন মারাত্মক ব্যাঘাত (disruption) যা জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের এতো ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে যে জনগোষ্ঠী বা সমাজ নিজস্ব সম্পদের সাহায্যে টিকে থাকতে পারেনা। দুর্যোগ, ঝুঁকি প্রক্রিয়ার একটা অভিঘাত (shock)। আপদ, বিপদাপন্নতা ও অপর্যাপ্ত সক্ষমতা বা ঝুঁকির বিরূপ প্রভাব রোধ ব্যবস্থায় ঘাটতি সমন্বিতভাবে দুর্যোগ সৃষ্টি করে।

-ISDR, Terminology: Basic terms of disaster risk reduction (অনুবাদ- নিরাপদ)

১.১. দুর্যোগ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা

দুর্যোগের আঘাতে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়, সেবা ব্যবস্থা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্মে গুরুতর বিঘ্ন ঘটে এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠী শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়।[৩]

[1] DMB (2010), National Plan for Disaster Management 2010-2015

[2] MoEF (2009), Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, Ministry of Environment and Forests, Government of Bangladesh

[3] NIRAPAD (2010), World Vision Training Handout Session

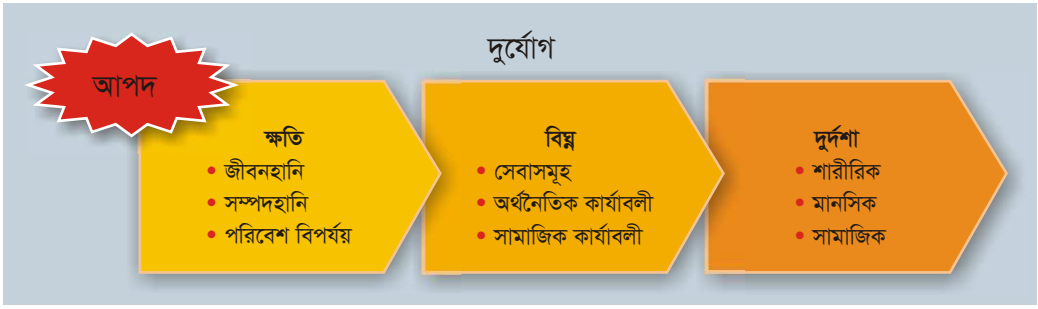

জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি

- জীবন- আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর অনেকেই মারা যেতে পারে বা আহত হতে পারে।
- সম্পদ- সম্পদ, যেমন- অর্থনৈতিক সম্পদ, উৎপাদনের উপকরণ, ফসল, প্রাণীসম্পদ, ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কাঠামো এবং অন্যান্য ভৌতকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- পরিবেশ- পরিবেশ বিপর্যস্ত হতে পারে, যেমন- বনভূমির গাছপালা উপড়ে পড়ে, জলাভূমি আবর্জনায় ভরে যায়, ফসলি জমি বালি চাপা পড়ে ও পানির প্রাকৃতিক উৎস লবণাক্ত ও দূষিত হয়ে যায়।

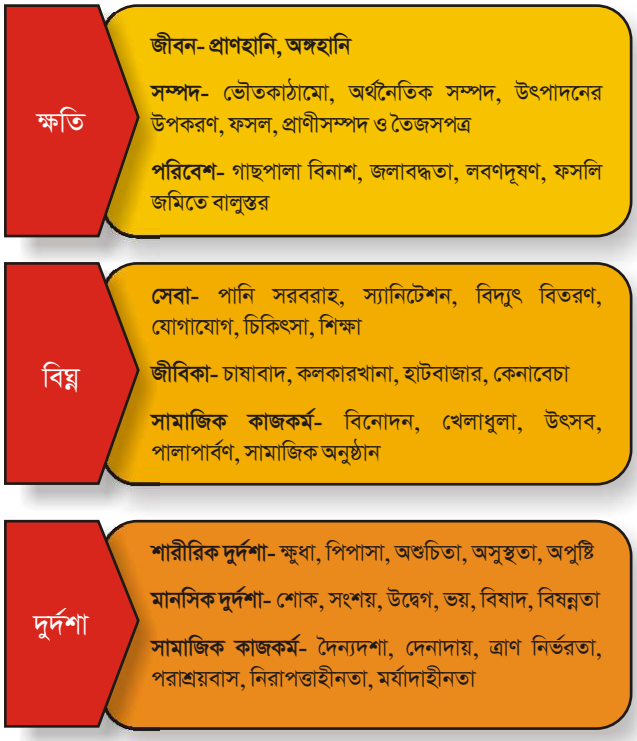

সেবা ব্যবস্থা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্মে বিঘ্ন

- সেবা- পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ বিতরণ, যোগাযোগ, চিকিৎসাকেন্দ্র ও স্কুল-কলেজ অচল হয়ে পড়ে।
- পরিবেশ- পরজীবিকা, যেমন- চাষাবাদ, কলকারখানা, হাটবাজার ও কেনাবেচা বন্ধ হয়ে যায়।
- সামাজিক কাজকর্ম- সামাজিক কাজকর্ম, যেমন- বিনোদন, খেলাধুলা, উৎসব, পালাপার্বণ ও সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।

জনগোষ্ঠীর দুর্দশা

- শারীরিক দুর্দশা- সম্পদ উপার্জন ও সেবাসমূহ না থাকার কারণে মৌলিক ও জরুরি চাহিদাগুলো মেটাতে পারেনা। ফলে ক্ষুধা, পিপাসা, অশুচিতা, অসুস্থতা ও অপুষ্টিতে কষ্ট পায়।
- মানসিক দুর্দশা- সংকট ও জীবনযাত্রায় আকস্মিক পরিবর্তনের কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে শোক, সংশয়, উদ্বেগ, ভীতি, হতাশা, বিষাদ ও বিষণ্নতায় ভোগে।
- সামাজিক দুর্দশা- সম্পদ, জীবিকা ও আশ্রয়হীনতার ফলে দৈন্যদশা, দেনাদায়, ত্রাণ নির্ভরতা, অপরের আশ্রয়ে বসবাস, নিরাপত্তাহীনতা ও মর্যাদাহীন কাজে অংশগ্রহণ স্বীকার করে নিতে হয়।

দুর্যোগ	ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা	সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের সংখ্যা	নিহত লোকের সংখ্যা	সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা (কিমি)	ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ (কিমি)
সাইক্লোন সিডর ২০০৭ সাল	২০০	৫৬৪,৯৬৭	৩,৩৬৩	১,৭১৪	১,৮৭৫
সাইক্লোন আইলা ২০০৯ সাল	৬৪	২৪৩,১৯১	১৯০	২,২৩৩	১,৭৪২
বন্যা ২০০৪ সাল	২৬৫	৮৯৪,৯৫৪	৭৪৭	১৪,২৭১	৩,১৫৮
বন্যা ২০০৭ সাল	২৬৩	৮১,৮১৭	৯৭০	৩,৭০৫	৮৮

তথ্যসূত্র: DMB,http://www.dmb.gov.bd/

প্রতি বছরই এদেশের কোন না কোন অঞ্চলে দুর্যোগ ঘটে থাকে। ১৯৭০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে ১৫ বার; এতে সব মিলিয়ে দেড় লক্ষেরও বেশি লোক নিহত হয়েছে; আর এই একই সময়ে বন্যা হয়েছে ২৪ বার, এতে প্রায় ষাট লক্ষ ঘর সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[৪]

সাম্প্রতিককালে সিডর ও আইলায় ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলো। এর ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর এমন ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো যে ক্ষতি পুষিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য প্রচুর মানবিক সাহায্য ও পুনর্বাসন সহায়তা দরকার হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধান আপদ

বন্যা: বন্যা একটি নিয়মিত ঘটনা। সাধারণ বন্যা দেশের ২০ থেকে ২৫ শতাংশ এলাকা প্লাবিত করে। তবে বড় আকারের বন্যা দেশের ৬০ শতাংশ বা বেশি এলাকা প্লাবিত করে থাকে। ১৯৮৭, ১৯৮৮ বা ১৯৯৮ সালে এ ধরণের ভয়াবহ বন্যা হয়েছিলো। ১৯৯৮ সালের বন্যায় দেশের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা ডুবে গিয়েছিলো ও ৫ লক্ষ বাড়িঘর নষ্ট হয়েছিলো, আর এতে বাস্তুচ্যুত হয়েছিলো প্রায় ৩ কোটি লোক।

খরা: বাংলাদেশে খরার ঝুঁকি রয়েছে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ২৪ বার খরার কবলে পড়েছে। এরমধ্যে, ১৯৫১, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬১, ১৯৭২, ১৯৭৫, ১৯৮১, ১৯৮৪ ও ১৯৮৯ সালের খরা ছিলো খুবই মারাত্মক। তবে দেখা গেছে যে, খরায় কখনও সারা দেশ একযোগে আক্রান্ত হয়নি। সাধারণত যে ধরণের খরা হয় তাতে দেশের শতকরা ৪৭ ভাগ এলাকা এর কবলে পড়ে ও ৫৩ ভাগ মানুষ ভুক্তভোগী হয় (WARPO, 2005)।

[4] DMB, Past Disaster Information http://www.dmb.gov.bd/

ঘূর্ণিঝড়: গত ১০ বছরে দেশের দক্ষিণাঞ্চল কমপক্ষে ৩ বার ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়েছে। এরমধ্যে ২০০৭ সালের সিডর ও ২০০৯ সালের আইলা ছিলো খুবই ভয়াবহ। সিডরে প্রায় ৫ হাজার লোক নিহত বা নিখোঁজ হয়েছে; আর এতে ১৫ লক্ষ ঘরবাড়ি নষ্ট হয়েছে। এছাড়া ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালে উপকূলীয় অঞ্চল ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়েছিলো; এতে যথাক্রমে ২৫০,০০০ ও ১৩৮,৮৮২ জন মারা গিয়েছিলো।
DMB, Past Disaster Information http://www.dmb.gov.bd/

নদীভাঙ্গন: নদীভাঙ্গন একটি চলমান প্রক্রিয়া। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা ও কপোতাক্ষ নদীর তীরবর্তী এলাকায় প্রতিবছর প্রায় ১০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর এতে প্রায় ৯ হাজার হেক্টর জমি নদীগর্ভে চলে যায়।

তথ্যসূত্র: DMB (2010), National Plan for disaster Management 2010-2015

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় ক্ষতি

ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাস একযোগে আসে। প্রবল বাতাস আর পানির তোড়ে ঘর ও অন্যান্য সবকিছুর সাথে পায়খানা ও নলকূপ ভেসে যায়। বন্যার সময় নিচু জায়গার নলকূপ ও পায়খানা ডুবে যায়। নলকূপের পানি দূষিত হয়ে পড়ে; পায়খানার কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। এগুলো তখন আর ব্যবহার করা যায়না।

উঁচু জায়গায় যে নলকূপ বা পায়খানা টিকে থাকে সেগুলোও সবাই সহজে ব্যবহার করতে পারেনা। কারণ রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় চলাচল খুব কঠিন হয়ে পড়ে; অনেকক্ষেত্রেই প্রয়োজনের সময় তারা সেখানে যেতে পারেনা। এছাড়া, ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার কারণে অনেকেই নিজের বাড়িতে থাকতে পারেনা। এরা বাঁধের উপর বা রাস্তার পাশে অথবা উঁচু কোন খাসজমিতে ছাপড়া বেঁধে বাস করে। এসব জায়গায় নলকূপ বা পায়খানা বসানোর সুযোগ থাকেনা। উপরন্তু, এদের অনেকেরই তখন নলকূপ বা পায়খানা বসানোর টাকা থাকেনা।

দুর্যোগ, পরিবেশের যে ক্ষতি করে তার ফলে পানির মূল উৎস স্থায়ীভাবে নষ্ট বা দূষিত হয়ে যেতে পারে। ২০০৯ সালে আইলার জলোচ্ছ্বাসে বাঁধ ভেঙ্গে সমুদ্রের যে পানি ঢুকেছিলো তাতে বিরাট এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিসহ সব পানি লবণাক্ত হয়ে গেছে। এই পানি এখন মানুষের ব্যবহারোপযোগী নয়। ঐ এলাকার জনগোষ্ঠীকে এখন দূরবর্তী এলাকা থেকে পানি আনতে হচ্ছে।

বায়ুমন্ডলের উপাদানগুলো সূর্যের তাপ ধরে রেখে পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে রাখে। পানিচক্র ও কার্বনচক্র পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। বাষ্পীভবন, মেঘ ও বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পানিচক্র সম্পন্ন হয়। পরিবেশের সাথে প্রাণীজগৎ অক্সিজেন ও কার্বন বিনিময়ের মাধ্যমে পরিবেশ ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু মানুষ তার কার্যকলাপের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। ফলে বায়ুমন্ডলের যে উপাদানগুলোর তাপ ধারণ করার ক্ষমতা বেশি (যেমন, কার্বন), সেগুলোর পরিমাণ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

১.২. জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা

জলবায়ু হলো কোন এলাকা বা অঞ্চলের ২৫-৩০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা। "একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমন্ডলের উপাদানসমূহের স্বল্প কয়েকদিনের গড় বা ১ থেকে ৭ দিনের গড় ফলকে আবহাওয়া বলা হয়। বায়ুমন্ডলের উপাদান বলতে বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ু প্রবাহের দিক ও গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘের পরিমাণ ও মেঘের প্রকারভেদ ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদিকে বোঝায়। আর কোন স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘকালের (৩০ বছর বা তারও বেশি সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ুমন্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর যে সাধারণ অবস্থা দেখা যায়, তাকে ওই স্থানের জলবায়ু বলে"।

- সিডিএমপি (২০০৯), দুর্যোগকোষ

জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়ত প্রাকৃতিক ঘটনা; তবে মানুষের কর্মকান্ডে এটি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর সব জায়গায় ভৌত, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার উপর প্রভাব ফেলছে।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি নজরে আসছে। ন্যাশনাল এ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম অফ এ্যাকশন (২০০৯) 'সার্ক ম্যাটিওরোলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টার (এসএমআরসি)' এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছে যে, ১৯৬১-১৯৯০ সাল এই তিরিশ বছরের তথ্য বিশ্লেষণে দেশের বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।[৫] আবহাওয়া দপ্তরের রংপুর কেন্দ্রের ১৯৭৮-২০০২ সালের সংগৃহীত তথ্য,

বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ ও গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, সাধারণভাবে, প্রতি বছর যথাক্রমে ০.০৩৫ ও ০.০২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস হারে বৃদ্ধির ইঙ্গিত করে। এছাড়াও, সামগ্রিকভাবে বছরে মোট বৃষ্টিপাতহীন দিনের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা ও উপকূল অঞ্চলে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা গেছে।[৬]

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে তুলনামূলক সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত এসএমআরসি'র এক জরিপে দেখা গেছে যে, বিগত ২২ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে (হিরণ পয়েন্টে প্রতি বছর ৪.০ মি.মি., চর চাঙ্গায় প্রতি বছর ৬.০ মি.মি. এবং কক্সবাজারে প্রতি বছর ৭.০ মি.মি.) যা বিগত ১০০ বছরের সমুদ্র পৃষ্ঠের বৈশ্বিক উচ্চতা বৃদ্ধির গড়ের থেকে অনেক গুণ বেশী।[৭]

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তন দেশের বর্তমান অনেক সমস্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে বাড়িয়ে দিবে। আশঙ্কা করা যাচ্ছে যে -

- ক্রমবর্ধমান সংখ্যার ঘূর্ণিঝড়, সাথে অধিক গতিবেগের ঝড়ো হাওয়া ও জলোচ্ছ্বাস, উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে আগের চেয়ে বেশি ক্ষয়-ক্ষতি ঘটাবে;
- বর্ষাকালে বাংলাদেশসহ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকা অঞ্চলে আগের থেকে ভারি ও অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ঘটবে, যার ফলে-
  - বেশি পরিমাণে পানি প্রবাহের ফলে বাঁধ উপচিয়ে বা ভেঙ্গে নগর ও গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বন্যা সৃষ্টি করবে;
  - নদী ভাঙ্গন, যার কারণে বসতভিটা ও চাষের জমি নদীগর্ভে চলে যাবে;
  - নদীগুলোতে অধিক মাত্রায় পলি জমা হবে। ফলে প্রাকৃতিক জল-নিষ্কাশনে বিঘ্ন ও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে;
- হিমালয়ের বরফ গলার কারণে বছরের উষ্ণতর মাসগুলোতে নদীতে জলপ্রবাহ বৃদ্ধি এবং বরফ গলা শেষ হলে নদীতে জলপ্রবাহ প্রবাহ হ্রাস ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাবে;
- অস্বাভাবিক ও কম বৃষ্টিপাতের ফলে দেশে, বিশেষ করে দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে খরা বৃদ্ধি পাবে;
- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের নিচু এলাকা ডুবে যাওয়া এবং নদী ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ও সুপেয় পানির ঘাটতি; ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে; পাশাপাশি রক্ষাবাঁধের ভেতরে জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যাহত হবে যার ফলে কৃষি খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।
- উষ্ণতর এবং অধিক আর্দ্রতার কারণে রোগব্যাধির প্রকার ও সংক্রমণ বেড়ে যাবে।

- MoEF (2009), Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), Government of Bangladesh

[5] MoEF (2009), National Adaptation Programme of Action (NAPA), Ministry of Environment and Forests, Government of Bangladesh

[৬] প্রাগুক্ত

[৭] প্রাগুক্ত

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিশ্চয়তা

"বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এ্যান্ড এ্যাকশন প্ল্যান" যে সব সমস্যা বা আপদের আশঙ্কা করছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একদিকে জলবায়ু পরিবর্তন আপদের পৌনঃপুনিকতা ও প্রচন্ডতা বাড়িয়ে দেয়। আপদগুলো হয়ে উঠে আরও ভয়াবহ ও ক্ষতিকর। পৌনঃপুনিক ও প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়, অস্বাভাবিক বন্যা বা তীব্র নদী ভাঙ্গনের পৌনঃপুনিক আঘাতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কাঠামো বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন সরাসরি জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা বিপর্যস্ত করে। যেমন, উপকূল এলাকায় লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতার কারণে প্রচলিত কৃষি প্রায় অচল হয়ে পড়তে পারে। এই দুই তরফা বিপর্যয়ের ফলে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বহুগুণ বেড়ে যায় ও বারবার ভেঙ্গে পড়া কাঠামো পুন:নির্মাণ করার সময়, সুযোগ, সম্পদ বা সক্ষমতা অতি সীমিত হয়ে পড়ে।

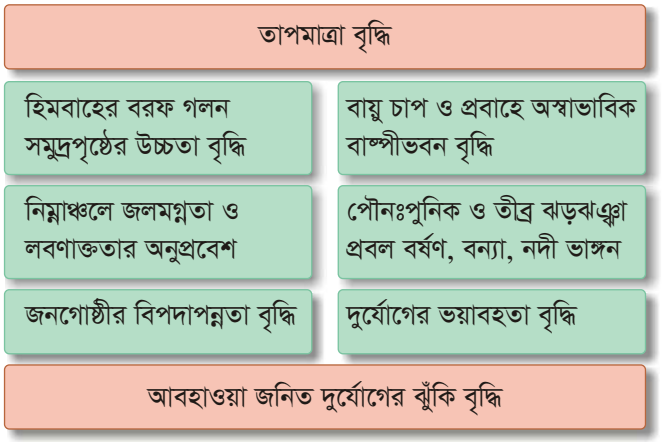

উপরন্তু, জলবায়ু পরিবর্তন সরাসরি জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা, তথা পানি, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের মাধ্যমে পানির প্রাকৃতিক উৎস দূষিত হতে পারে, বা খরাপ্রবণ এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, অথবা উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার মাধ্যমে রোগ জীবাণু ও জীবাণুবাহক কীটপতঙ্গের বংশ বিস্তারে বিশেষ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়ত প্রাকৃতিক ঘটনা হলেও মানুষের কর্মকান্ডের ফলে এর প্রভাব ত্বরান্বিত হয়। আবার, দুর্যোগের এই পরিবর্তন আরো ত্বরান্বিত হতে পারে। স্থানীয় পর্যায়েও এটা হতে পারে। যেমন, খরাপ্রবণ অঞ্চলে অতি উত্তোলনের কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি চাষের কারণে লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিলো; আইলার ফলে অতিদ্রুত ও স্থায়ীভাবে ঐ এলাকার পানি এবং মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:
পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা

নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা মূলত জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার সাথে জড়িত। রোগব্যাধির ঝুঁকি থেকে মুক্ত জীবন আর টেকসই জীবিকার জন্য এগুলো খুবই জরুরি। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন মৌলিক চাহিদার মধ্যে পড়ে। জাতিসংঘের '৬৪/২৯২ রেজুলেশন জুলাই, ২০১০' এটিকে মানবাধিকার হিসাবে গণ্য করেছে। তাছাড়া, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চায় ঘাটতি হলে নানাবিধ রোগের বিস্তার ঘটে, অসুখবিসুখে মানুষের কষ্ট বাড়ে, চিকিৎসার জন্য খরচ বাড়ে, আর উৎপাদন কাজে শ্রম সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে।[৮]

২.১. নিরাপদ পানি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা

যে পানিতে ক্ষতিকারক রোগ-জীবাণু নেই এবং অন্যান্য খনিজ উপাদান সহনীয় মাত্রায় থাকে, যদিও অনেক ক্ষেত্রে স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণযুক্ত হতে পারে তাকেই নিরাপদ পানি বলে।

নিরাপদ পানির বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো -

১. ময়লা, আবর্জনা, বর্জ্য ও জীবাণুমুক্ত;
২. ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থসমূহ মুক্ত বা সহনীয় মাত্রার মধ্যে (যেমন - আর্সেনিক) ও অন্যান্য রাসায়নিক এবং খনিজ পদার্থসমূহ নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় থাকে;
৩. স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধহীন; এবং
৪. সুপেয়।

উৎস: ওয়াটারএইড

যে পানির মধ্যে উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য থাকে না, সেই পানিকে দূষিত পানি বলে। দূষিত পানি পান করলে বিভিন্ন রোগ হতে পারে। যেমন- রোগজীবাণু দ্বারা দূষিত পানি পান করলে কলেরা, আমাশয়, ডায়রিয়া, টাইফয়েড ও হেপাটাইটিস হতে পারে; রাসায়নিক বা খনিজ দ্বারা দূষিত পানি পান করলে আর্সেনিকোসিস, ফ্লুরোসিস, লেড পয়জনিং প্রভৃতি রোগ হতে পারে। আবার দূষিত পানির সংস্পর্শে থেকেও কিছু রোগ হয়, যেমন- কৃমি, খোস-পাঁচড়া ও নানা ধরণের চর্মরোগ। এই কারণে, খাওয়া বা গৃহস্থালি কাজের জন্য সবসময় নিরাপদ পানি ব্যবহার করা উচিত।

[৮] Local Government Division (2005), National Sanitation Strategy; Ministry of MoLGRD&C, GoB

দূষিত পানিজনিত রোগ

রোগজীবাণু বা রাসায়নিক বা খনিজ দ্বারা পানি দূষিত হতে পারে। কোন কোন রোগ দূষিত পানি পান করলে হয়; আবার দূষিত পানির সংস্পর্শে এলে অনেক ধরণের রোগ হতে পারে।

রোগজীবাণু দ্বারা দূষিত পানি পান করলে যে সব রোগ হতে পারে	দূষিত পানির সংস্পর্শ থেকে যে সব রোগ হতে পারে	রাসায়নিক বা খনিজদূষণে দুষ্ট পানি পান করলে যে সব রোগ হতে পারে
কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, প্যারা টাইফয়েড ও হেপাটাইটিস	কৃমি, খোস-পাঁচড়া, চুলকানি ও বিভিন্ন ধরণের চর্মরোগ	আর্সেনিকোসিস, ফ্লুরোসিস ও লেড পয়জনিং

নিরাপদ পানির উৎস

বাংলাদেশে বর্তমানে সাধারণত যে সকল উৎস থেকে নিরাপদ পানি পাওয়া যায় সেগুলো হলো ভূ-গর্ভস্থ পানি, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি ও বৃষ্টির পানি।

ভূ-গর্ভস্থ পানি: ভূ-গর্ভস্থ পানি সাধারণত জীবাণুমুক্ত। নলকূপের (গভীর ও অগভীর নলকূপ, ডিপসেট পাম্প, তারা ও তারা দেব পাম্প) সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হয়। তবে, ভূ-গর্ভস্থ পানি খনিজ বা রাসায়নিক পদার্থ যেমন, আর্সেনিক দ্বারা দূষিত হতে পারে বা লবণাক্ত হয়ে যেতে পারে। এমন হলে নলকূপের পানি নিরাপদ থাকেনা। এই দূষিত পানি নিরাপদ করার পদ্ধতি বেশ জটিল ও ব্যয়বহুল। পরিবার পর্যায়ে এটি করা সম্ভব নয় বললেই চলে। তাছাড়া, বন্যার সময় ডুবে গেলে নলকূপ থেকে নিরাপদ পানি পাওয়া যায়না। নলকূপের প্লাটফর্ম উঁচু হলে বন্যার সময় নলকূপ সচল রাখা সম্ভব।

ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি: ভূ-পৃষ্ঠের উপরের নদী, পকুর বা জলাশয় থেকে পানি পাওয়া যায়। ভূ-পৃষ্ঠের উপরের এই পানি অধিকাংশক্ষেত্রে রোগজীবাণু দ্বারা দূষিত। খাওয়া বা থালা-বাসন ধোওয়ার জন্য ব্যবহার করতে হলে এই পানি শোধন করে নিতে হয়। এই পানি ফুটিয়ে বা ফিল্টারে ছেঁকে অথবা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করা যায়। ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি জীবাণুমুক্ত করার জন্য পিএসএফ ব্যবহার করা হয়। এটি বেশ সহজ ও লাগসই প্রযুক্তি। তবে, পানি লবণাক্ত বা রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা দূষিত হলে পিএসএফ থেকে নিরাপদ পানি পাওয়া যায়না। এছাড়াও একটি স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বোতলে পানি নিয়ে তা সূর্যের আলোতে ৬ ঘন্টা রেখে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা যায়। এই পদ্ধতিতেও পানির রাসায়নিকদূষণ বা লবণাক্ততা দূর করা যায়না।

বৃষ্টির পানি: নিরাপদ পানির চাহিদা মেটানোর জন্য বর্ষাকালে সরাসরি বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা যেতে পারে। তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্য এই পানি খুবই নিরাপদ তবে অনেকদিন রেখে দিলে এবং যথাযথ নিয়ম পালন না করলে এতে জীবাণু দূষণ দেখা দিতে পারে। এই পদ্ধতিতে সাধারণত ঘরের চাল থেকে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে নিরাপদ পাত্রে পানি সংরক্ষণ করা হয়। এটি খুবই সরল ও সহজলভ্য প্রযুক্তি। যেসব এলাকায় বছরে ১,৬০০ মি.মি. বৃষ্টিপাত হয় সেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়।

এছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলে ঝর্ণা থেকে পানি পাওয়া যায়। এই পানি সাধারণত নিরাপদ।

পানিকে নিরাপদ রাখার উপায়সমূহ

উৎস	সংগ্রহ	বহন	সংরক্ষণ	ব্যবহার
• চারদিক পরিষ্কার রাখতে হবে • উঁচু জায়গায় নলকূপ তৈরি করতে হবে • নির্দিষ্ট দূরত্বে (কমপক্ষে ১০ মিটার) পায়খানা স্থাপন করতে হবে • কাছে কোন পচা ডোবা গর্ত বা ময়লা আবর্জনার স্তুপ থাকা উচিত নয়	• পাত্র পরিষ্কার হতে হবে • হাত পরিষ্কার হতে হবে • কোন ভাবেই পানির মধ্যে হাত দেওয়া যাবেনা	• আঁচল দিয়ে ঢাকা যাবেনা • ঢাকনা থাকতে হবে • পাত্রের মুখের চেয়ে বড় বা সমান ঢাকনা ব্যবহার করতে হবে • কলসের মুখের মধ্যে কোনভাবেই হাত দেওয়া যাবেনা	• শুকনা স্থানে পানির পাত্র রাখতে হবে • উঁচু স্থানে পানির পাত্র বসাতে হবে • পানির পাত্র ঢাকনা দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে	• পরিষ্কার পাত্র/গ্লাসে পানি পান করতে হবে • পরিষ্কার হাতে গ্লাস ধরতে হবে • গ্লাসের মুখে হাত দেয়া যাবেনা

উৎস: ওয়াটারএইড ইন বাংলাদেশ

স্বাভাবিকভাবেই, নিরাপদ পানির ব্যবহার নির্ভর করে এর প্রাপ্যতার উপর। নাগালের মধ্যে যে পানি পাওয়া যায় তা দূষিত হয়ে গেলে অনেকেই প্রয়োজনমত নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে পারেনা। তখন রোগ-ব্যাধির ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই পানির দূষণ রোধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে পানিদূষণ ও রোগবিস্তার রোধ করার চেষ্টা করা হয়।

২.২. স্যানিটেশন বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা

রোগ বিস্তারের পথ বন্ধ করার জন্য মলমূত্র, ময়লা ও আবর্জনা অপসারণের সঠিক উপায় হলো স্যানিটেশন। এর লক্ষ্য হলো মলমূত্র, ময়লা পানি ও গৃহস্থালি আবর্জনা এমনভাবে সরানো যাতে পরিবেশ বা পানির দূষণ না ঘটে। সাধারণভাবে স্যানিটেশন ব্যবস্থা বলতে মানুষের মলমূত্র অপসারণের সেবা ও সুযোগ বোঝায়।

যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করলে তা থেকে পরিবেশ ও পানি দূষিত হতে পারে। আবার, অনিরাপদ পায়খানা (যেমন, ঝুলন্ত পায়খানা) ব্যবহার করলে বা পানির উৎসের খুব কাছে পায়খানা তৈরি করলে তা থেকেও পরিবেশ বা পানি দূষিত হতে পারে। এভাবে রোগ বিস্তার হতে পারে।

১০০% স্যানিটেশনের বৈশিষ্ট্য

- সবার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা রাখা
- কেউ খোলা জায়গায় পায়খানা করবেনা
- সবাই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করবে
- পায়খানা ব্যাবহারে যথাযথ পরিবেশ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা
- ওয়াটার সিল থাকা

তাই, স্যানিটেশনের অন্যতম প্রধান কৌশল হলো স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা। এর উদ্দেশ্য হলো রোগবিস্তার চক্র ভেঙ্গে দেওয়া ও রোগজীবাণু ছড়ানো বন্ধ করা। এতে প্রধান বিষয় হলো-

- মলমূত্র এক জায়গায় গর্ত করে এমনভাবে জড়ো করে রাখতে হবে যাতে এটি ছড়িয়ে যেতে না পারে বা পরিবেশ দূষণ না করে, বিশেষ করে, পানির উৎসের সাথে মিশতে না পারে।
- মলত্যাগের জায়গা ও মল জমা হওয়ার গর্তে যেন মাছি বা অন্য পতঙ্গ প্রবেশ করে রোগজীবাণু ছড়াতে না পারে।
- মলের গর্তে উৎপন্ন গ্যাস দুর্গন্ধ না ছড়িয়ে বের হয়ে যেতে পারে।[৯]

বাংলাদেশ জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল ২০০৫ (সংশোধিত ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১০)- এর স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিম্নলিখিত ল্যাট্রিনগুলোকে স্বাস্থ্যসম্মত বিবেচনা করা যায়ঃ

- ঢাকনাসহ গর্ত ল্যাট্রিন
- ফ্লিপ/ওয়াটার সিল যুক্ত পিট ল্যাট্রিন (সরাসরি বা অফসেট)
- ওয়াটার সিলযুক্ত স্ল্যাব ল্যাট্রিন (সরাসরি বা অফসেট পিট)
- বেন্ড সিলযুক্ত অফসেট পিট ল্যাট্রিন
- ইকো-স্যান/ কম্পোস্টিং ল্যাট্রিন এবং
- সুয়্যার লাইন/ সেপ্টিক ট্যাঙ্কযুক্ত ল্যাট্রিন

বর্তমানে, বাংলাদেশে, বিশেষ করে গ্রাম এলাকায়, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা হিসাবে রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিনের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। এই পদ্ধতিতে মাটিতে একটি গভীর গর্ত করে তাতে বালি ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরি রিং ও স্ল্যাব বসিয়ে ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের উচ্চতা বিবেচনা করে গর্তটি খোঁড়া হয়। এই প্রযুক্তিটি বেশ সুলভ ও স্বাস্থ্যসম্মত।

রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন

মাটিতে একটি গর্ত করে তার উপর একটি স্ল্যাব বসিয়ে সহজে ও অল্প খরচে ল্যাট্রিন বানানো যায়। গর্ত যাতে ভেঙ্গে না পড়ে সেজন্য সিমেন্টের রিং ব্যবহার করা যেতে পারে। স্ল্যাবের সাথে জলাবদ্ধ প্যান ও গর্তের গ্যাস বের হওয়ার জন্য ভেন্টিলেশন পাইপ লাগানো যেতে পারে।

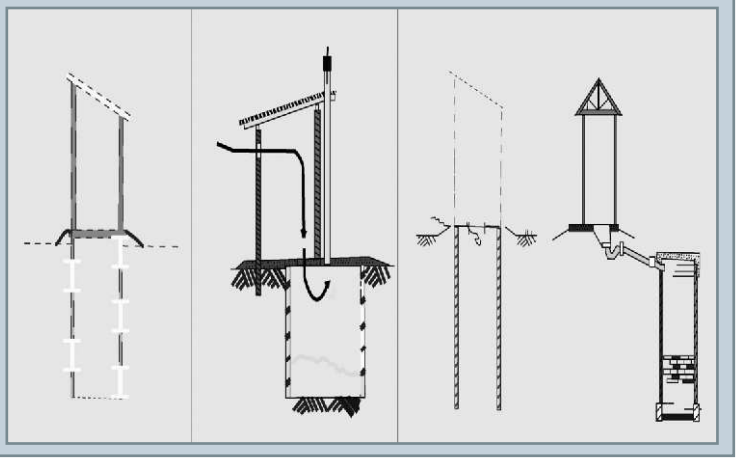

[৯] প্রাগুক্ত

২.৩. স্বাস্থ্যবিধিচর্চা বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা

স্বাস্থ্যবিধিচর্চার মূল বিষয় হলো জ্ঞান ও বিবেচনা কাজে লাগিয়ে এমনভাবে পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যবহার করা যাতে নিজেকে ও জনগোষ্ঠীর সবাইকে রোগব্যাধির ঝুঁকি থেকে মুক্ত রাখা যায়।

কেন স্বাস্থ্যবিধিচর্চার প্রসার দরকার?

স্বাস্থ্যবিধিচর্চার উদ্দেশ্য হলো রোগব্যাধির হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য পরিচ্ছন্ন থাকা ও রোগবিস্তার প্রতিরোধের জন্য পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা। দুর্যোগকালে রোগজীবাণুর দ্রুত বংশবিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় আর নিরাপদ পানি ও নিরাপদ ল্যাট্রিন ব্যবস্থার ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে এসময়ে মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন ঝুঁকিতে পড়ে।

স্বাস্থ্যবিধিচর্চা প্রসার কী?

স্বাস্থ্যবিধিচর্চার প্রসার রোগবিস্তার প্রতিরোধে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়ায়। এটি বিধিবদ্ধ জ্ঞানের সহায়তায় জনগোষ্ঠীর জ্ঞান, মনোভাব ও অভ্যাসে পরিবর্তন আনার একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পরিবারের সদস্যগণ পানি ব্যবহার, বর্জ্য ও মলমূত্র অপসারণ এবং পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে সমর্থ্য হয়।

কার্যকর স্বাস্থ্যবিধিচর্চা প্রসারের প্রধান উপাদানগুলো হলো-

- তথ্য ও জ্ঞানের পারস্পরিক আদান প্রদান;
- সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করা;
- প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ ও সুযোগ সৃষ্টি করা।

তিন ধরণের কাজের জন্য স্বাস্থ্যবিধিচর্চা প্রসার করা যেতে পারে-

- স্বাস্থ্য বিষয়ক ঝুঁকিপূর্ণ অভ্যাস কমানো;
- সুযোগ ও ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
- কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ বাড়ানো।

-UNICEF, ROSA (2008), Behaviour Change Communication In emergencies: A Toolkit

স্বাস্থ্যবিধি পালনের মাধ্যমে রোগবিস্তারের পথে অনেকভাবে বাধা সৃষ্টি করা যায় এবং এভাবে পানি ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো সম্ভব হয়। কিভাবে রোগবিস্তার হয় এবং নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের মাধ্যমে রোগব্যাধির ঝুঁকি কমানো যায় তা জানা ও এই জ্ঞান দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগানোই স্বাস্থ্যবিধিচর্চার মূল বিষয়।

স্বাস্থ্যবিধিচর্চার লক্ষ্য

স্বাস্থ্যবিধিচর্চার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো-

- স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- মলমূত্রের নিরাপদ অপসারণ;
- শৌচকর্মের পরে ও খাবার তৈরির আগে হাত ধোওয়া;
- নিরাপদ পানি ব্যবহার ও এর সঠিক সংরক্ষণ;
- মশা, মাছি ও অন্যান্য জীবাণুবাহী পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ।

- WEDC, WHO 2011, Technical Notes

স্বাস্থ্যবিধিচর্চার জন্য নিরাপদ পানি পাওয়ার উপায়, দূষণরোধে মানব বর্জ্য ও গৃহস্থালি আবর্জনা অপসারণ করার সঠিক পদ্ধতি এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে করণীয়গুলো জানা দরকার। স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে এসব বিষয়ে জানা যায়।

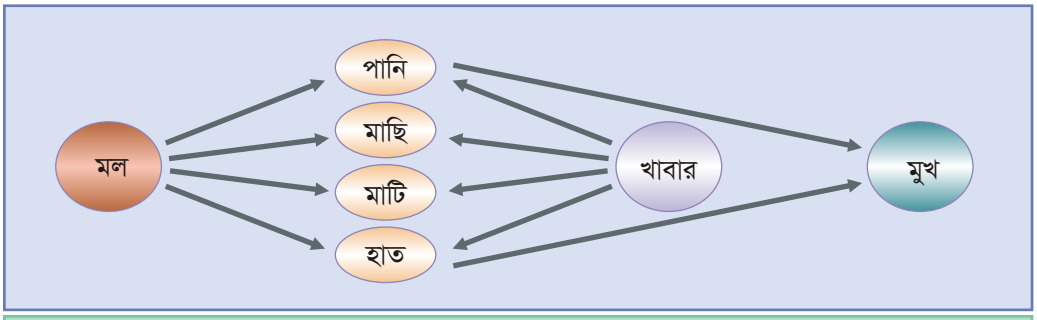

মলমূত্র থেকে যেভাবে রোগ ছড়ায়

আমাদের শরীরের সব বর্জ্য ও খাদ্যনালীতে অবস্থিত রোগজীবাণু মলের মাধ্যমে দেহের বাইরে আসে। সব মলে, এমনকি শিশুর মলেও রোগজীবাণু থাকে। খোলা জায়গায় বা খোলা ল্যাট্রিনে মলত্যাগ করলে এ থেকে রোগজীবাণু বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ে। মশা, মাছি, হাঁস, মুরগী, কুকুর, বিড়াল বা বাতাসের মাধ্যমে এই রোগজীবাণু পানিতে, খাবারে, থালাবাসনে বা খাবারের জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে। আবার মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ডায়রিয়া, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস বা কৃমিসহ অনেক ধরণের রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

রোগবিস্তার রোধের জন্য প্রথমতঃ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে যাতে মলমূত্র থেকে পানি ও মাটি রোগজীবাণু দ্বারা দূষিত না হয়ে পড়ে আর মাছি কিংবা পোকামাকড় যাতে মলমূত্র থেকে রোগজীবাণু চারিদিকে ছড়িয়ে না ফেলে।

দ্বিতীয়তঃ ল্যাট্রিন ব্যবহারের পরে আর খাবার তৈরি বা খাওয়ার আগে ভালোভাবে ও সঠিক পদ্ধতিতে হাত ধোওয়া যাতে হাতে লেগে থাকা রোগজীবাণু খাবারের সাথে শরীরে প্রবেশ করতে না পারে। সেইসাথে খাবার ঢেকে রাখতে হবে; এরফলে মাছি বা পোকামাকড় এসে খাবারে বসতে পারবেনা ও খাবারে রোগজীবাণু মেশাতে পারবেনা। আর সবসময় খাওয়ার ও গৃহস্থালি কাজের জন্য নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে।

হাত ধোয়া

হাত ধোয়ার কৌশল

১. প্রথমে হাত অল্প পানি দিয়ে ভিজিয়ে ভালো করে সাবান লাগিয়ে নিন।
২. এরপর বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের তালু রাখুন।
৩. ডান হাত দিয়ে বাম হাতের তালুর উপরে ঘষুন; একইভাবে হাত বদলান।
৪. ডান হাতের তালু দিয়ে বাম হাতের তালুর পিছনে ঘষুন।
৫. বাম হাতের আঙ্গুলগুলোর ভিতরে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো ঢুকিয়ে নিয়ে ঘষুন; একইভাবে হাত বদলান।
৬. বাম হাতের তালু দিয়ে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ঘষুন; একইভাবে হাত বদলান।
৭. বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের আঙ্গুলগুলো এক জায়গায় করে ঘষুন; একইভাবে হাত বদলান।
৮. সবশেষে, একটি পরিষ্কার গামছা বা তোয়ালে দিয়ে দুই হাত মুছে নিন।

হাত ধোয়ার গুরুত্ব

- রোগ জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়
- পেটের অসুখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়
- পানি ও মলবাহিত জীবাণু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়

হাত ধোয়ার গুরুত্বপূর্ণ সময়

- খাওয়ার আগে
- পায়খানা থেকে এসে
- খাবার তৈরি ও পরিবেশনের আগে

হাত ধোয়ার উপকরণ

- হাত ধোয়ার উপকরণ হিসেবে শুধুমাত্র সাবান ও নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগজনিত বিঘ্ন

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ফলে সম্পদ ও পরিবেশের যে ক্ষতি হয় ও সেবাসমূহে যে বিঘ্ন ঘটে তার প্রভাব পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি - ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা নদী ভাঙ্গনে নলকূপ বা ল্যাট্রিন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে; পানি ও স্যানিটেশনের কাঠামোগুলো ভেঙ্গে যেতে পারে। বন্যার পানিতে নলকূপ ও পায়খানা ডুবে যেতে পারে। এমন অবস্থায় লোকজন নিরাপদ পানি পায়না, বা তাদের স্যানিটেশনের সুযোগ থাকেনা।

বন্যার পানি দ্বারা দূষণ বিস্তার - বন্যার পানিতে ল্যাট্রিন ডুবে গেলে ল্যাট্রিনের মল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং পরিবেশ ও পানির উৎস দূষিত করতে পারে। খোলা মাঠে মল ত্যাগ করলে সহজেই দূষণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। ঝুলন্ত ল্যাট্রিন থেকেও এভাবে দূষণ ছড়াতে পারে। এরকম হলে জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানি পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

স্থানান্তর ও অপর্যাপ্ত নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন - ঘূর্ণিঝড় বা বন্যাজনিত দুর্যোগে আক্রান্ত লোকজন নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। অস্থায়ী আবাসে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা তেমন থাকেনা। আবার, নিচু এলাকা জলমগ্ন হলে এলাকার জনগোষ্ঠী বসতি ছেড়ে স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। এদের জীবন ও জীবিকা এমনভাবে বিপর্যস্ত হয় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নতুন বসতিতে পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সম্পদ ও সুযোগ তাদের থাকেনা।

ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা হ্রাস - জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যেতে পারে বা জমানো পানি কমে যেতে পারে। খরাপ্রবণ এলাকায় এটি ঘটে থাকে। তবে এর জন্য মানুষের কর্মকান্ডই বেশি দায়ী। সাধারণত কৃষিকাজে চাহিদা মেটানোর জন্য পানি অতি উত্তোলন করলে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়। এমন হলে এলাকার জনগোষ্ঠীর পানির প্রাপ্যতা কমে আসে। ফলে, তারা প্রয়োজনমতো নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে পারেনা, সেইসাথে, পানির উপর নির্ভরশীল স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাও ব্যবহার করতে পারেনা।

লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ও পানির উৎস দূষণ - আবার, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের কারণে পানির প্রাকৃতিক উৎস সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে- দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আইলা পরবর্তীকালে যেমন হয়েছে। এরজন্যও মানুষের কর্মকান্ড বহুলাংশে দায়ী। চিংড়ি চাষের জন্য চাষীরা তাদের ঘেরে নোনা পানি ঢুকিয়েছিলো। আইলার সময় দুর্বল বাঁধ ভেঙ্গে আরও নোনা পানি এলাকায় ঢুকে পড়ে ও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে। এখন এই এলাকায় নিরাপদ পানি একদম নেই বললেই চলে। ফলে, এলাকার লোকজন প্রয়োজনমতো নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে পারছেনা। সেইসাথে, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাও ব্যবহার করতে পারছেনা।

নোনা পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি - নোনা পানি ও নোনা পরিবেশ স্বাস্থ্যের জন্য খুব ক্ষতিকর। এ থেকে নানা রকম চর্মরোগ হতে পারে। এ রকম পরিবেশ স্বাস্থ্যের উপর, বিশেষ করে, প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। ফলে এতে কিশোরী ও গর্ভবতী নারী বেশি ভুক্তভোগী হয়। এছাড়াও, উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া রোগজীবাণু ও জীবাণুবাহক কীটপতঙ্গের বংশ বিস্তারে বিশেষ সহায়ক। ফলে এলাকায় পানিবাহিত ও পতঙ্গবাহিত রোগ, বিশেষ করে, ডায়রিয়া, আমাশয় ও ম্যালেরিয়া, এমনকি কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশে খাবার পানিতে লবণ দূষণ

বেশিমাত্রায় লবণাক্ত পানি পান করলে উচ্চ রক্তচাপসহ নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। উপকূল এলাকার বেশ বড় সংখ্যায় গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় একলাম্পসিয়া, প্রিএকলাম্পসিয়া ও উচ্চরক্তচাপ ধরা পড়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নৌ-বন্দরে অবস্থিত চালনা উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের গাইনোকলজি ডিপার্টমেন্টের ২০০৭ সালের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর মাসের এন্টিনেটাল চেক-আপের রেকর্ড পরীক্ষা হয়েছে। দেখা গেছে যে, ১৬ থেকে ৪০ বছর বয়সী ৫৬১ জন গর্ভবতী নারীর মধ্যে ১১৮ জন (২১%) কোন না কোন ধরণের উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যায় ভুগছে। উপকূল এলাকার বাইরের মাতুয়াইলে এ ধরণের সমস্যায় ভুক্তভোগী গর্ভবতী নারীর হার শতকরা ২ থেকে ৬.৫ ভাগ, যার তুলনায় এই হার অনেক বেশি।

- Khan, A., & et. Al., The Lancet, Volume, 371, Issue 9610, Page 385, 2 February 2008

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য পানির নতুন উৎস, যেমন- ভূ-গর্ভস্থ পানির বদলে বৃষ্টির পানি, অথবা নতুন প্রযুক্তি, যেমন- প্রচলিত নলকূপের বদলে লবণপানি শোধন প্রযুক্তি, খুঁজে বের করার দরকার হতে পারে। বিষয়টি মৌলিক চাহিদা হিসাবে দেখা বিশেষ জরুরি আর এভাবে দেখতে হলে নীতিগত নির্দেশনা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রয়োজন হবে।

তৃতীয় অধ্যায়:

বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা বিষয়ে পরিবর্তনজনিত উদ্বেগ

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের বর্ধমান প্রচন্ডতা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পৌনঃপুনিক ঝড়ঝঞ্ঝা, বিধ্বংসী বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ পানির প্রাকৃতিক উৎস এবং পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা অকেজো করে ফেলছে। জলাশয়গুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ভূ-পৃষ্ঠের উপরের ও নিচের পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। বারবার আপদের আঘাতে অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে ও বিদ্যমান প্রযুক্তিগুলো অচল হয়ে পড়ছে। ফলে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় প্রাপ্যতার সংকট দেখা দিচ্ছে। তবে, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগজনিত প্রভাবকগুলো দেশের এক এক অঞ্চলে এক একভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

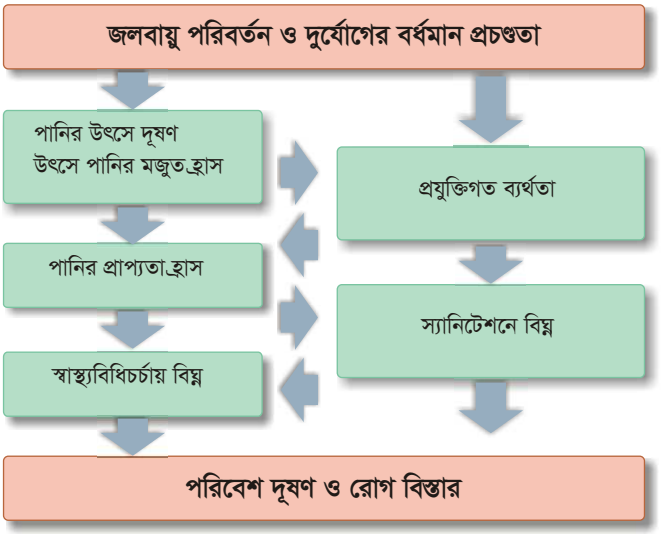

৩.১. উপকূলীয় অঞ্চল

এলাকা ও অবস্থান- সমুদ্রের তটবর্তী এলাকা হলো উপকূল এলাকা। সমুদ্রের প্রধান তিনটি প্রভাব- জোয়ার-ভাটার প্রভাব, নোনাপানির অনুপ্রবেশ ও ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস, এই তিন সূচকের মাপকাঠিতে নির্ধারিত মোট ১৯টি জেলা (বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, গোপালগঞ্জ, যশোর, ঝালকাঠি, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নড়াইল, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, সাতক্ষীরা, শরীয়তপুর) নিয়ে

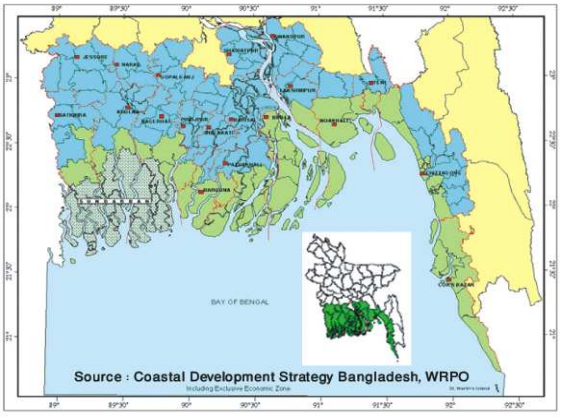

উপকূল অঞ্চল গঠিত। এর মধ্যে ১২টি জেলা বঙ্গোপসাগরের ৭১০ কি.মি. তটরেখা সংলগ্ন। তটভূমির গঠন ও পানি প্রবাহের গতি প্রকৃতির ভিন্নতার কারণে একে মোটাদাগে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বদরমোকাম থেকে ফেনী নদী পর্যন্ত উপকূল অঞ্চল পূর্বভাগ, ফেনী নদীর মোহনা থেকে তেতুলিয়া নদী পর্যন্ত মধ্যভাগ ও তেতুলিয়া নদী থেকে পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গা নদী পর্যন্ত পশ্চিমভাগ[১০]।

আপদসমূহ - এই অঞ্চলের প্রধান আপদগুলো হলো ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বিরামহীন বৃষ্টি ও জোয়ারজনিত প্লাবন। জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধি ও মেঘাচ্ছন্ন দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি। সেই সাথে পানি ও মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি। ঝড়োবাতাস আর জলোচ্ছ্বাসের দাপটে নলকূপ, পিএসএফ ও ল্যাট্রিনগুলো বারবার ভেসে যায়, চুরমার হয়ে পড়ে। তাছাড়া, লবণ পানি আর নোনা বাতাসে টিন বা কংক্রিটে তৈরি ল্যাট্রিন টেকসই হয়না।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উদ্বেগ - এলাকার সব থেকে বড় সমস্যা হলো লবণদূষণ, বিশেষ করে, উপকূল অঞ্চলের পশ্চিমভাগ, এত বেশি মাত্রায় লবণাক্ত হয়ে পড়েছে যে মাটির উপরের ও নিচের পানির প্রাকৃতিক উৎস থেকে নিরাপদ খাওয়ার পানি বা গৃহস্থালি কাজের জন্য উপযোগী পানি পাওয়া যাচ্ছেনা। ফলে নিরাপদ পানি সরবরাহে এলাকার নলকূপ, পুকুর ও পিএসএফগুলো আর কার্যকর থাকছেনা।

উপকূলীয় অঞ্চল			
আপদসমূহ	**জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবক**	**পানি সরবরাহ সংক্রান্ত প্রভাবক**	**স্যানিটেশন সংক্রান্ত প্রভাবক**
• ঘূর্ণিঝড় • বিরামহীন বৃষ্টি • জোয়ারজনিত প্লাবন	• তাপমাত্রা বৃদ্ধি • লবণাক্ততা বৃদ্ধি • বাতাসে আর্দ্রতা বৃদ্ধি • মেঘাচ্ছন্ন দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি	• লবণদূষণে দুষ্ট পানির উৎস • মিঠা পানি সরবরাহে টিউবওয়েল অকার্যকর • মিঠা পানি সরবরাহে পিএসএফ অকার্যকর	• ঝড়-বাতাসে অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়া • লবণাক্ততার কারণে অবকাঠামোর ক্ষয় • গরমের কারণে টিনের ল্যাট্রিন ব্যবহারে অসুবিধা

৩.২. নদী অববাহিকা ও চর অঞ্চল

এলাকা ও ভৌগোলিক অবস্থান - নদীর গতিপথ বরাবর তীরবর্তী যে এলাকার বৃষ্টির পানি গড়িয়ে নদীতে নামে সেই এলাকা নিয়ে গঠিত হয় ঐ নদীর অববাহিকা। হাওর ও পার্বত্য এলাকা বাদে বাংলাদেশের প্রধান ক'টি নদী, যেমন- ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, পদ্মা ও মেঘনার তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা আর এসব নদীর মধ্যে পলি জমে গড়ে উঠা চর নিয়ে এই অববাহিকা ও চর অঞ্চল ধরা হয়েছে। এগুলো বাংলাদেশের মাঝ বরাবর উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। এই এলাকায় রয়েছে লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, শেরপুর, রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, চাঁদপুর ও কুমিল্লা জেলা।

[১০]পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৫), উপকূলীয় অঞ্চল নীতি

আপদসমূহ - বর্ষাকালে হিমালয় থেকে উৎসরিত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এবং আসামের সাথে মেঘনা নদী দিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকার বর্ষণের পানি এই এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে এই অঞ্চলে বর্ষা মৌসুমে প্রবল বন্যা হয়; সেই সাথে থাকে তীব্র নদীভাঙ্গন। আবার বর্ষাকালের শেষে শুরু হয় দীর্ঘ অনাবৃষ্টি। তখন খরা শুরু হয়। নদীর ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে, জলাশয়গুলো শুকিয়ে যায় ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যায়। তখন নলকূপগুলো খুব একটা কাজে আসেনা। নদী ভাঙ্গনেও অনেক নলকূপ ও ল্যাট্রিন নদীগর্ভে চলে যায়। আবার, বন্যার সময় নলকূপ ও ল্যাট্রিন পানিতে ডুবে যায়। উঁচু জায়গার ল্যাট্রিন সম্পূর্ণভাবে ডুবে না গেলেও রাস্তা ডুবে যাওয়ার কারণে লোকজন উঁচু জায়গার নলকূপ বা ল্যাট্রিন সহজে ব্যবহার করতে পারেনা। তাছাড়া, পানির স্তর উপরে উঠে আসার কারণে এ থেকে ঠিকমতো মল অপসারণ হয়না। উপরন্তু, ডুবে যাওয়া ল্যাট্রিনের মল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পানি ও পরিবেশ দূষিত করে। ফলে বন্যার সময় নলকূপ বা ল্যাট্রিন খুব একটা কাজে আসে না।

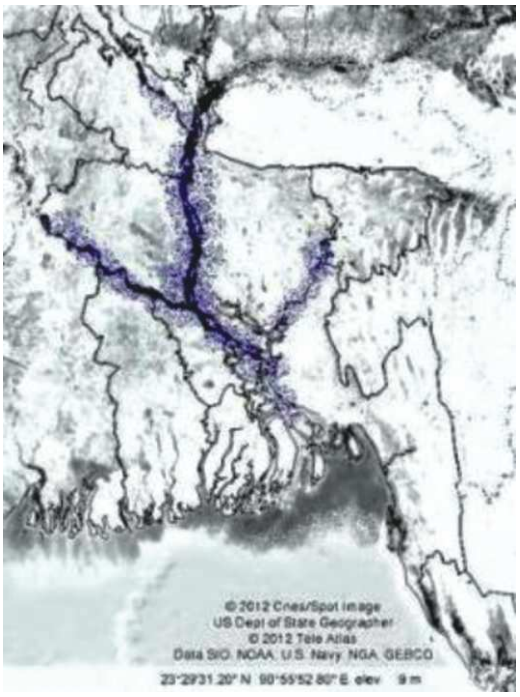

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত উদ্বেগ - প্রচলিত রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন বন্যার মাসগুলোতে স্যানিটেশন তথা পানি ও পরিবেশ দূষণ রোধে তেমন কাজে আসছে না; 'বেশি পানি-কম পানি'র চক্রের কারণে এলাকায় প্রচলিত নলকূপ বছরে অল্প কয়েক মাস ছাড়া নিরাপদ পানি সরবরাহ করতে পারছেনা।

নদী অববাহিকা ও চর অঞ্চল			
আপদসমূহ	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবক	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত প্রভাবক	স্যানিটেশন সংক্রান্ত প্রভাবক
• বন্যা • নদীভাঙ্গন • বালুকরণ • জলাবদ্ধতা • খরা	• তীব্র গরম • অতিবর্ষণ • বাতাসে আর্দ্রতা বৃদ্ধি • দীর্ঘ অনাবৃষ্টি কাল	• ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া • বন্যায় নলকূপ ডুবে যাওয়া • নদীভাঙ্গনে নলকূপের ক্ষয়ক্ষতি • নলকূপের কার্যকারিতা হ্রাস • জলাবদ্ধতার কারণে ভূ-উপরিস্থ পানির দূষণ	• বন্যার কারণে অবকাঠামো ডুবে যাওয়া • পানি বাড়ার কারণে ল্যাট্রিন ভরে যাওয়া • নদীভাঙ্গনে অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি • ডুবো ল্যাট্রিনের মাধ্যমে পানির দূষণ

৩.৩. পার্বত্য অঞ্চল

এলাকা ও অবস্থান - দেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ১৩,২৯৫ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে এই অঞ্চল বিস্তৃত। এই পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলা। অনেকগুলো পাহাড় নিয়ে এই অঞ্চল গড়ে উঠেছে; কোথাও কোথাও এগুলো সর্বোচ্চ প্রায় ৪,০০০ ফুট উঁচু। এই এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সাতটি পাহাড়ি নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখা। এর সাথে আছে অসংখ্য ঝর্ণা আর ছড়া। পুরো অঞ্চল বনে ঢাকা; তবে নির্বিচারে গাছ কাটার কারণে এখন আগের মতো ঘন নয়[১১]।

আপদসমূহ - বর্ষাকালে এই এলাকায় অতিবর্ষণ হয়। বছরের অন্য সময়ে অনাবৃষ্টির প্রকোপ দেখা দেয়। এখানে পানির প্রধান উৎস হলো ঝর্ণা ও ছড়া। পাহাড়ি এলাকা বলে ভূ-গর্ভস্থ পানি পাওয়া যায়না বা নলকূপ ব্যবহার করা যায়না। শুষ্ক মৌসুমে এই ছড়া ও ঝর্ণাগুলো শুকিয়ে যায়। ফলে পানির অভাব দেখা দেয়। আবার বর্ষাকালে পাহাড়ি রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে পড়ে বা ভূমিধ্বসের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তখন জনগোষ্ঠী সহজে পানি সংগ্রহ করতে পারেনা। পাথুরে বা শক্ত মাটিতে প্রচলিত রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন বসানো কষ্টসাধ্য। তাছাড়া প্রবল বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে ল্যাট্রিন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। উপরন্তু, বৃষ্টির ফলে ঢাল বেয়ে পানির যে ঢল নিচে নেমে আসে তা অনেক সময় পয়ঃবর্জ্যসহ পাদদেশীয় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে সেখানকার জনগোষ্ঠীর জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

Chittagong Hilltracts

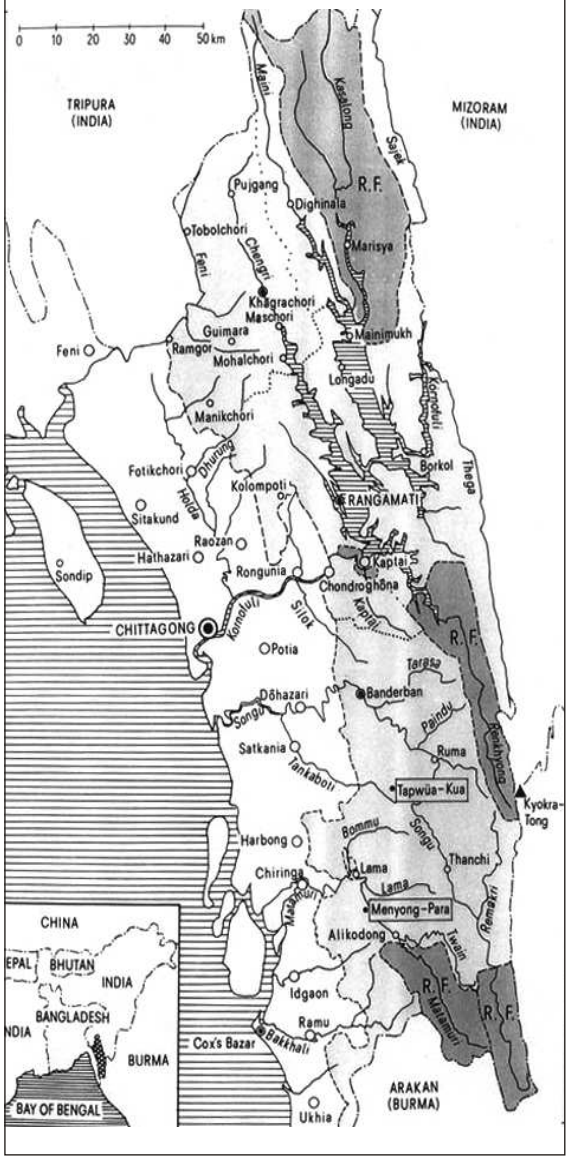

[১১] এশিয়াটিক সোসাইটি (২০০৬), বাংলাপিডিয়া

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উদ্বেগ - জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিশ্চয়তায় শুষ্ক মৌসুমে পাহাড়ি ঝর্ণা ও ছড়া শুকিয়ে যাওয়া এবং বর্ষণসহিষ্ণু ও পাহাড়ি এলাকার উপযুক্ত ল্যাট্রিন প্রযুক্তির অভাব।

পার্বত্য অঞ্চল			
আপদসমূহ	**জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবক**	**পানি সরবরাহ সংক্রান্ত প্রভাবক**	**স্যানিটেশন সংক্রান্ত প্রভাব**
• পাহাড়ি ঢল • ভূমিধ্বস	• গরমের মাত্রা বৃদ্ধি • অতিবর্ষণ • দীর্ঘ অনাবৃষ্টি কাল	• পানির প্রাকৃতিক উৎসে স্বল্পতা • পাহাড়ি ঝর্ণা ও ছড়া শুকিয়ে যাওয়া • ভূ-পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যের কারণে নলকূপের অকার্যকারিতা	• অতি বর্ষণে অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি • বর্ষণের ফলে নিম্নমুখী ঢলের মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ছড়িয়ে পড়া ও পাদদেশীয় এলাকায় দূষণ সৃষ্টি

৩.৪. হাওর অঞ্চল

এলাকা ও অবস্থান - হাওরগুলো আসলে মৌসুমি জলাভূমি যা শুষ্ক মৌসুমে একেবারে শুকিয়ে যায় ও ফসলের জমি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা নিয়ে বাংলাদেশের হাওর অঞ্চল গঠিত। যার উত্তরে মেঘালয় পর্বতমালা (ভারত), দক্ষিণে ত্রিপুরার পাহাড় (ভারত) এবং পূর্ব দিকে মণিপুরের (ভারত) উচ্চভূমি দিয়ে ঘেরা। প্রায় ৫,০২৫ বর্গ কি.মি. আয়তনের এই অঞ্চলে রয়েছে প্রায় ৪৭টি বড় হাওর এবং বিভিন্ন মাপের প্রায় ৬,৩০০টি বিল। এগুলোর মধ্যে প্রায় ৩,৫০০টি স্থায়ী ও ২৮০০টি অস্থায়ী বা ঋতুভিত্তিক বিল। সিলেট জেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাওরগুলো হলো- শনির হাওর, হাইল হাওর, হাকালুকি হাওর, ডাকের হাওর, মাকার হাওর, ছাইয়ার হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর এবং কাওয়া দীঘি হাওর। সুরমা, কুশিয়ারার সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য ছোটখাটো পাহাড়ি নদী, যেমন- মনু, খোয়াই, যাদুকাটা, পিয়ান, মোগরা প্রভৃতি সংযুক্ত হয়েছে হাওরের জলনির্গম প্রণালীর সঙ্গে[১২]।

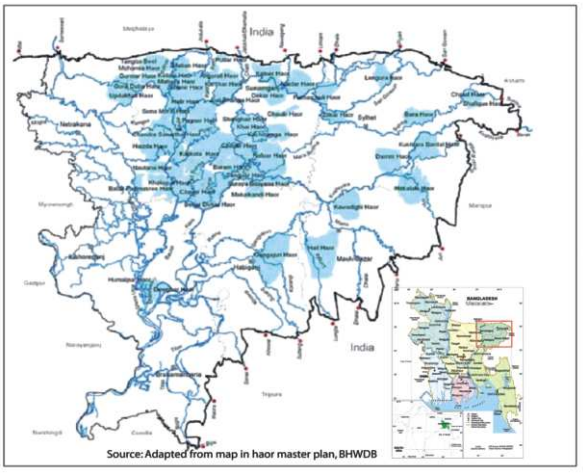

Source: Adapted from map in haor master plan, BHWDB

আপদসমূহ - এখানকার প্রধান আপদ হলো বর্ষার শুরুতে আকস্মিক বন্যা। বর্ষাকালে হাওরগুলো পানিতে ভরে যায়; তখন ঝড়োবাতাস, তীব্রস্রোত, আর ঢেউ এর প্রকোপ দেখা দেয়। আকস্মিক বন্যা আর ঢেউ

[১২] Ministry of Water Resources, GoB (2012), Master Plan of Haor Areas

এর প্রকোপে নলকূপ ও ল্যাট্রিন পানিতে ভেসে যেতে পারে বা এগুলো ভেঙ্গে যেতে পারে। আবার শুষ্ক মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যায়, নলকূপ থেকে প্রয়োজনমতো পানি পাওয়া যায় না।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উদ্বেগ - শুষ্ক মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া বর্ষণসহিষ্ণু ল্যাট্রিন প্রযুক্তির অভাব।

হাওর অঞ্চল			
আপদসমূহ	**জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাবক**	**পানি সরবরাহ সংক্রান্ত প্রভাবক**	**স্যানিটেশন সংক্রান্ত প্রভাবক**
• আকস্মিক বন্যা • তীব্র স্রোতের প্রকোপ • ঝড়ো বাতাস ও ঢেউ	• অতি গরম • অতিবর্ষণ • অতি আর্দ্রতা	• হাটি কিংবা হাতল্বক ভাঙ্গনে নলকূপের ক্ষতি	• অতিবর্ষণে অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি • অতি বর্ষণ ও স্রোতের মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ছড়িয়ে পড়া ও দূষণ বিস্তার

৩.৫. বরেন্দ্রভূমি ও মধুপুর অঞ্চল

এলাকা ও অবস্থান - চারপাশের প্লাবন ভূমি থেকে পৃথক পুরাতন পলল দ্বারা গঠিত বরেন্দ্র ভূমির আয়তন প্রায় ৭,৭৭০ বর্গ কি.মি.। বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী ও বগুড়া জেলা জুড়ে এ অঞ্চল বিস্তৃত। আর মধুপুর অঞ্চল জামালপুরের দক্ষিণভাগ থেকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা পর্যন্ত বিস্তৃত। প্লাবনভূমি থেকে প্রায় ১০ মিটার উঁচু এই এলাকার মোট বিস্তার প্রায় ৪,২৪৪ বর্গ কি.মি.[১৩]।

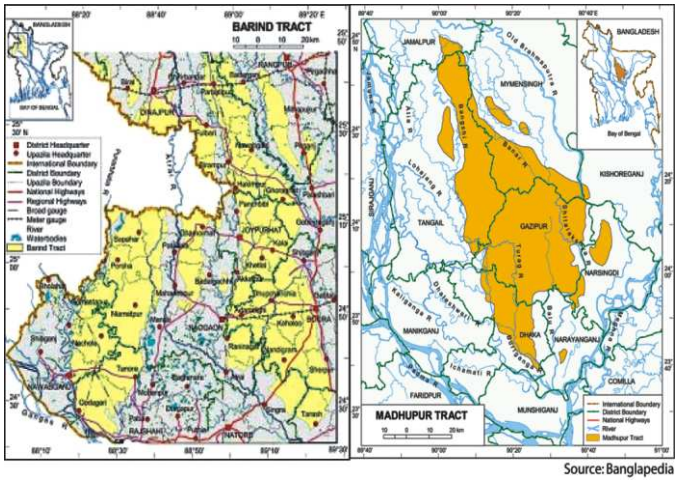

Source: Banglapedia

আপদসমূহ - স্বল্পমেয়াদী বর্ষাকালের কারণে এই দুই অঞ্চলে মৌসুমী খরা দেখা দেয়। এ সময় নদীতে পানি কমে যায়, জলাশয়গুলো শুকিয়ে যায় আর ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায়। নলকূপ থেকে তখন প্রয়োজনমতো পানি পাওয়া যায়না। এখানকার মাটি শক্ত হওয়ার কারণে রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন বসানো কষ্টসাধ্য। তাছাড়া, ঢাল বিশিষ্ট এলাকা হওয়ার কারণে বর্ষাকালে নিচু এলাকাগুলো জলমগ্ন হয়। এতে পয়ঃবর্জ্য জমে ও দূষণ ছড়ায়।

[১৩]প্রাগুক্ত

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উদ্বেগ - শুষ্ক মৌসুমে পানির ঘাটতি ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া।

বরেন্দ্র ভূমি ও মধুপুর অঞ্চল			
আপদসমূহ	**জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবক**	**পানি সরবরাহ সংক্রান্ত প্রভাবক**	**স্যানিটেশন সংক্রান্ত প্রভাবক**
• টর্নেডো • খরা	• শুষ্ক গরম বাতাস • স্থানীয় পর্যায়ে গরম • অনাবৃষ্টি	• ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া • নলকূপের কার্যকারিতা হ্রাস • ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস শুকিয়ে যাওয়া	• শক্ত মৃত্তিকার কারণে রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন তৈরি করতে অসুবিধা • ঢাল বিশিষ্ট এলাকা হওয়ার কারণে বর্ষাকালে নিচু এলাকার জলমগ্নতা ও দূষণ

চতুর্থ অধ্যায়:
পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধিচর্চার উপর দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তন ও পৌনঃপুনিক দুর্যোগ অঞ্চলভিত্তিক পানির প্রাকৃতিক উৎস নষ্ট করে, পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার ভৌতকাঠামো ভঙ্গুর করে ও সরবরাহে ঘাটতি সৃষ্টি করে। এর বিরূপ প্রভাব একই সাথে পরিবেশ, সমাজ ও স্বাস্থ্যের উপর পড়ে। এতে সমাজে সেবা প্রাপ্যতায় মারাত্মক ঘাটতি দেখা দেয়। জনগোষ্ঠীর পক্ষে তখন নিরাপদ পানি পাওয়া, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যবহার করা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

৪.১. পরিবেশগত

দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও জলবায়ু পরিবর্তন ক্রমবর্ধমানভাবে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। যেমন, জলাবদ্ধতা, লবণ দূষণ ও ভূত্বকের শুষ্কতা বাড়ছে; ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। পরিবেশগতভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্নভাবে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, দেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে ভয়াবহ খরা ও তীব্র শীত; হাওর অঞ্চলের অতিবৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যা; প্লাবনভূমি অঞ্চলের দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা ও উপকূলীয় অঞ্চলের ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙ্গনের পৌনঃপুনিকতা ও মাত্রা বৃদ্ধি এবং পাশাপাশি লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। এসকল প্রভাব সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশ তথা সুপেয় ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য পানির উৎস সমূহকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা অকার্যকর করে ফেলে।

৪.১.১. লবণদূষণ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে খুলনা, বরিশাল ও উপকূলীয় অঞ্চলের চিরাচরিত আপদ, যেমন- ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির পৌনঃপুনিকতা ও ভয়াবহতা অতীতের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে এবং দিন দিন বেড়েই চলেছে। যার ফলে দুর্যোগকালে অতিরিক্ত নোনা পানির অনুপ্রবেশ ভূমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি করছে। তাতে ভূ-গর্ভস্থ সুপেয় পানির মজুত নষ্ট হচ্ছে ও পানের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। লবণদূষণের কারণে অন্যান্য সুপেয় পানির উৎস, যেমন- নদী, খাল, পুকুর ইত্যাদির পানিও ধীরে ধীরে দূষিত হয়ে পড়ছে। লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে ল্যাট্রিনসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামোগুলোও দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে। ফলশ্রুতিতে প্রচলিত প্রযুক্তি, যেমন- নলকূপ, পিএসএফ, রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন অকার্যকর হয়ে পড়ছে এবং জনগোষ্ঠী দূষিত পানি পান ও অস্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

> "গুনারি, কামীনিবাসি ও আশেপাশের এলাকা ঘুরে দেখা গেল, চারিদিকে কেবল পানি আর পানি। তারপরও পানির জন্যই মানুষের হাহাকার। এমনিতেই উপকূলীয় মানুষকে যুদ্ধ করতে হয় সাগরের নোনাপানির সঙ্গে। তার উপর, আইলা আঘাত হানার পর তলিয়ে গেছে খাল-বিল-ডোবা আর পুকুর। টিউবওয়েলের পানিতেও এখন লবণ। খাবার পানি যোগাড় করতে সেসব এলাকার মানুষকে উত্তাল শিবসা নদী পাড়ি দিতে হয়। তারপরও যে পানি পাওয়া যায় তা খাওয়ার মতো নয়। এ কারণে রোগ-ব্যাধি লেগেই থাকে। ডায়রিয়া, কলেরা ও জলবসন্ত সেই এলাকার এখনো নিয়মিত ব্যাপার।"
>
> - শামীম আল আমীন; বিশেষ প্রতিনিধি, চ্যানেল ওয়ান; 'ঝড় থেমেছে কান্না থামেনি'; সাংবাদিকের সাক্ষ্য- আইলাদুর্গত মানুষের এক বছরের জীবন-যন্ত্রণা, ২০১০

৪.১.২. মরুময়তা

দেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রভাব হিসেবে অনাবৃষ্টিকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অনাবৃষ্টির কারণে এসব এলাকায় প্রায়শই তীব্র মৌসুমী খরা দেখা দেয়। এ ধরণের খরার সময়ে এসব অঞ্চলের প্রায় সবগুলো নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর ও মিঠা পানির উৎস শুকিয়ে যায়, পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর তার স্বাভাবিক অবস্থান থেকে অনেক নিচে চলে যায়। ফলে সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমে আসে। এ সময় অধিকাংশ নলকূপেই পানি থাকেনা, এমনকি গভীর নলকূপেও অনেক সময় পানি পাওয়া যায়না। তাছাড়া, ভূ-উপরিস্থ পানি শুকিয়ে যায় বলে এক্ষেত্রে পুকুর পাড়ে বালির ফিল্টারও (পিএসএফ) কাজে আসেনা। তাই জনগোষ্ঠী বাধ্য হয়ে দূষিত পানি ব্যবহার করে ও নানাবিধ রোগব্যাধিতে ভোগে।

৪.১.৩. ক্রমবর্ধমান আপদপ্রবণতা

যদিও অঞ্চলভেদে আপদের ধরণ ভিন্ন, যেমন- উপকূল অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, হাওর এলাকায় আকস্মিক বন্যা, প্লাবনভূমিতে মৌসুমি বন্যা; জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশের প্রায় সব অঞ্চলের আপদপ্রবণতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রাকৃতিক আপদের পৌনঃপুনিকতা ও প্রচণ্ডতা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। এসব আপদে, বিশেষ করে, ঝড়, বন্যা ও নদীভাঙ্গনের কারণে দুর্যোগ কবলিত এলাকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কখনো কখনো সমূলে ভেঙ্গে পড়ে। এ অবস্থায় প্রচলিত প্রযুক্তি, যেমন- নলকূপ, পিএসএফ বা রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন ইত্যাদি প্রযুক্তিসমূহ নিরাপদ পানি সরবরাহ বা স্যানিটেশন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে কাজে আসছেনা।

৪.১.৪. জলাবদ্ধতা

মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও বন্যার পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে অপসারিত না হওয়ার ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও পৌনঃপুনিক দুর্যোগ, সেই সাথে মানুষের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসমূলক কাজ (যেমন, বাঁধ নির্মাণ) ও উন্নয়নমূলক কাজ (যেমন, রাস্তা নির্মাণ) এর ফলে দেশের অনেক এলাকা এখন জলাবদ্ধতাপ্রবণ হয়ে পড়েছে।

জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হলে জনগোষ্ঠীতে নানাবিধ দুর্ভোগ দেখা দেয় ও জরুরি সেবা, বিশেষ করে, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। জলাবদ্ধতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় নিরাপদ পানির অভাব দেখা দেয়। মানুষ তখন খাওয়া ও গৃহস্থালি কাজে দূষিত পানি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। ফলে নানাবিধ রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া, জলাবদ্ধ এলাকার ল্যাট্রিনগুলো পানিতে ডুবে যায়, এগুলো আর কাজে আসেনা। লোকজন খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে পরিবেশ দূষিত হয় ও পানিবাহিত রোগ ছড়ায়। জলাবদ্ধতা হলে নারী ও কিশোরীর দুর্ভোগের মাত্রা বহুলাংশে বেড়ে যায়। তারা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ক বিধি ঠিকমতো পালন করতে পারেনা। এছাড়াও মলমূত্র ত্যাগের জন্য দূরে বা খোলামেলা স্থানে যেতে হয় বলে তাদের যৌন হয়রানির ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

অস্বাভাবিক ভারি বর্ষণে ২০১১ সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় (সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর) জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছিল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী ২৫ আগস্ট ২০১১ পর্যন্ত সাতক্ষীরা জেলার ৮০০,০০০ মানুষ এই জলাবদ্ধতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো।

- Emergency Capacity Building Project (ECB) 2011 Flooding & Prolonged Water-logging in South West Bangladesh Coordinated Assessment Report

৪.২. সামাজিক প্রভাব

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকাকেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করছেনা, দেশের সামগ্রিক সামাজিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে ক্রমশই দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তুলছে। ফলে সামাজিক বৈষম্য, বঞ্চনা, অগ্রহণযোগ্যতা ও অভিগমন ইত্যাদি বেড়ে যাচ্ছে যার বিরূপ প্রভাব নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা, স্যানিটেশন সেবা ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার উপরও পড়ছে।

৪.২.১. বঞ্চনা

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে নিরাপদ পানির সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। জনগোষ্ঠীর সকলে প্রয়োজনমতো নিরাপদ পানি ও যথাযথ স্যানিটেশনের সুযোগ পাচ্ছেনা। ফলে নানাবিধ বঞ্চনার সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রথমত, দুর্যোগের আঘাতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা পৌনঃপুনিকভাবে ভেঙ্গে পড়ছে। ভেঙ্গে পড়া সেবা কাঠামো পুনরায় সচল করা সময় সাপেক্ষ। এই ক্রান্তিকালে জনগোষ্ঠী সেবা থেকে বঞ্চিত থাকছে। দুর্যোগের পৌনঃপুনিকতার কারণে তাদের বঞ্চনাকাল বারবার ফিরে আসছে। যেমন, সিডরের পরে আইলার কারণে একই ধরণের বঞ্চনা পুনরায় ভোগ করতে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, উৎস দূষিত হওয়ার কারণে নিকট স্থান থেকে নিরাপদ পানি সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছেনা। যেমন, আইলা কবলিত এলাকায় আর আগের মতো প্রতি বসতিতে নলকূপ বসিয়ে নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা যাচ্ছেনা। সবাইকে এখন দূরবর্তী এলাকা থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়। অনেকের পক্ষেই, বিশেষ করে, নারীর পক্ষে, দূরবর্তী স্থান থেকে পানি সংগ্রহ করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

তৃতীয়ত, দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার খরচ অনেকগুণ বেড়ে গেছে। যেমন, লবণদূষণ এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য প্রচলিত নলকূপ বা পিএসএফ এর বদলে রিভার্স অসমোসিস মেশিন (লবণ মুক্তকরণ প্রযুক্তি) দরকার। এর দাম নলকূপ বা পিএসএফ এর দামের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। সম্পদ ঘাটতির কারণে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বা মানবিক সাহায্য সংস্থাগুলো প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিভার্স অসমোসিস মেশিন বসাতে পারছেনা। ফলে জনগোষ্ঠীর অনেকেই ঝুঁকিপূর্ণ পানি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে।

আইলা এ্যাসেসমেন্ট

এনজিও ও ডিপিএইচই মিলে প্রায় ৩০০ টি টিউবওয়েল স্থাপন করেছিলো কিন্তু এগুলো আবার পানিতে ডুবে যায়, তাছাড়া ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর লবণাক্ত হয়ে যাওয়ায় এগুলো কোন কাজে আসছেনা। এখন নারীদের দিনে ৪-৫ ঘন্টা ব্যয় করে ২-৩ কিলোমিটার দূর থেকে পানি আনতে হচ্ছে। অনেকেই এতো কষ্ট করার বদলে ঝুঁকিপূর্ণ পানি ব্যবহার করছে। আগে যেখানে পানির জন্য পরিবার পিছু দৈনিক গড়ে ৪-৫ টাকা খরচ হতো, এখন সেখানে গড়ে ১৫-২০ টাকা লাগছে। বাঁধের উপর অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে যে কয়টা ল্যাট্রিন বসানো হয়েছিলো তা কেবল শতকরা ১২ ভাগ লোকের প্রয়োজন মেটাতে পারে। প্রতি দশ পরিবারের জন্য একটা ল্যাট্রিন ব্যবহার করার জন্য সবাইকে লাইনে দাঁড়াতে হয়। লাইনের সামনে পুরুষরা থাকে বলে নারী ও কিশোরীরা ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে পারেনা।

- ECB (2009), In-depth Recovery Needs Assessment of Cyclone Aila Affected Areas

৪.২.২. বৈষম্য

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ফলে নিরাপদ পানির সঙ্কট সৃষ্টি হলে বর্ধিত চাহিদা ও নিরাপদ পানির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে এক ধরণের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়, যা দুর্যোগকালীন সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনা। যাদের সে সামর্থ্য থাকে তারাই কেবল নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারে। একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ল্যাট্রিন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রেও একই ধরণের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। শুধু সামর্থ্যবান পরিবারের পক্ষেই দুর্যোগকালীন নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এর ফলে সমাজে একটি অসমতা বা বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

"যাদের দু-বেলা খাওয়ার পানি জোটেনা তাদের আবার পড়াশোনা!" কথাটি খুব সত্যি। আইলা শুরু হওয়ার পর থেকে গাবুরা, আশাশুনির মানুষগুলো ঠিকমতো পানিও পায়নি। গ্রামরক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে সাগরের নোনা পানি ঢুকে পড়ায় এখন গভীর নলকূপের পানিতেও লবণ, নোনা স্বাদ। ওই লোকগুলোর এখন পুকুরের পানিও লিটার দরে কিনে নিতে হয়। লিটার দশেকের এক কলস পানি কিনতে গুণতে হয় ৮ থেকে ১০ টাকা। যাদের নিজের নৌকা আর অনেকগুলো কলস আছে তারাই শুধু নৌকায় করে বাড়ি বাড়ি পানি দিয়ে যায়।

- পান্থ রহমান, সিনিয়র স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, চ্যানেল আই, সাংবাদিকের দিনলিপিতে 'আইলা কষ্ট!'; সাংবাদিকের সাক্ষ্য- আইলাদুর্গত মানুষের এক বছরের জীবন-যন্ত্রণা, ২০১০

৪.২.৩. দুর্ভোগ

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের প্রভাবে সৃষ্ট নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সংকট মোকাবেলায় জনগোষ্ঠীর পরিবারসমূহকে তাৎক্ষণিকভাবে নতুন একটি ব্যবস্থাপনার বন্দোবস্ত করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, লবণদূষণ বা বন্যার কারণে পরিবারের নিজস্ব নলকূপ ও ল্যাট্রিন নষ্ট হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে বিকল্প ব্যবস্থাপনা হিসেবে পরিবারের সদস্য, বিশেষ করে, নারী সদস্যদের দূরে থেকে অথবা অন্যের নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয়, ল্যাট্রিন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয় কিংবা অস্বাস্থ্যকর ও খোলামেলা স্থানে যেতে হয়। তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত এসকল ব্যবস্থাপনাসমূহ অনেকক্ষেত্রেই সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়না। ফলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ঘাটতির কারণে জনগোষ্ঠীকে নানাবিধ সমস্যায় পড়তে হয়।

২০০৭ সালের বন্যা

শতকরা ৯০-১০০ ভাগ ল্যাট্রিন পানিতে ডুবে গেছে। প্রায় সবাই খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে, শুধু অল্প কয়েকজন প্রতিবেশীর বাড়িতে যে কয়েকটা ল্যাট্রিন ডুবেনি সেগুলো ব্যবহার করে। আশ্রয়কেন্দ্রে নারীর জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। নারী ও কিশোরীদের অনেকেই প্লাস্টিকের ব্যাগে মল ত্যাগ করে তা লুকিয়ে রাখে ও সন্ধ্যার পরে বাইরে ফেলে দিয়ে আসে।

- DER, 2007, Bangladesh Flood 2007 DER Post Disaster Needs Assessment Report Summary

৪.২.৪. স্থানচ্যুতি

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জনগোষ্ঠীর অনেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বা পরিবারের সদস্য নিজ আবাসস্থল ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। তাদের এ স্থানচ্যুতি কখনো সাময়িক আবার কখনো কখনো স্থায়ী। তবে, এই স্থানচ্যুতি সাময়িক বা স্থায়ী যাই হোক না কেন, সাধারণত, বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলো শহরের বস্তিতে বা ঘনবসতি কোন স্থানে বাস করে। এসব এলাকায় প্রতিটি পরিবারের জন্য পৃথক পায়খানা নির্মাণ করার উপযোগী স্থান পাওয়া সম্ভব হয়না। ফলে স্থানান্তরিত পরিবার বা পরিবারের সদস্যগণ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি চর্চা করতে বা স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনা।

> সাইক্লোন আইলায় ৭৬,৪৭৮ পরিবার স্থানচ্যুত হয়েছে। এর মধ্যে ২৫,৯২৮ পরিবার কয়রা ও দাকোপে বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়েছে। অধিকাংশ পরিবার বিভিন্ন বাঁধ, রাস্তা বা কোন উঁচু স্থানে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নিয়েছে। এদের অবস্থা এতোই খারাপ যে তারা শহরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।
>
> - Cyclone Aila Joint UN Multisector Assessment & Response Framework, June 2010

৪.৩. স্বাস্থ্যগত

জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। দুর্যোগকালীন জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাবে জনগোষ্ঠীতে নানাবিধ রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৪.৩.১. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য

দুর্যোগের কারণে কবলিত এলাকায় স্বাভাবিকভাবেই নিরাপদ পানির উৎসগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা ও লবণাক্ততার কারণে নিরাপদ পানির অভাব দেখা দেয় যার ফলে দুর্যোগকবলিত জনগোষ্ঠীতে পরিবারসমূহের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ, যেমন, রান্নাবান্না, হাঁড়ি-পাতিল ধোয়া, গোসল করা, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি কাজে দূষিত পানির ব্যবহার বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি চর্চা করা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভবপর হয়ে উঠেনা। এ কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের পানিবাহিত রোগ, যেমন-ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, জন্ডিস, টাইফয়েড, প্যারা টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, খোসপাঁচড়া ও নানাবিধ চর্মরোগ সহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগব্যাধিতে ভোগে।

৪.৩.২. জনস্বাস্থ্য

দুর্যোগ, বিশেষ করে, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ও নদী ভাঙ্গনের কারণে দুর্যোগকবলিত এলাকার স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাগুলো ডুবে যায় বা ভেঙ্গে যায়; লবণাক্ততার কারণে নিরাপদ ল্যাট্রিনের কাঠামোগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় ফলে স্যানিটেশন ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা অকার্যকর হয়ে পড়ে। অপ্রতুল স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার কারণে জনগোষ্ঠীর পক্ষে ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা সম্ভব হয়ে উঠেনা। এছাড়াও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা না থাকায় যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ ও ময়লা আবর্জনা ফেলার

ফলে পরিবেশ ও পানি দূষণ ঘটে যার ফলে নানাবিধ রোগব্যাধির সংক্রমণ বাড়ে ও জনগোষ্ঠীর সকলের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। সর্বোপরি স্বাস্থ্যবিধিচর্চার সুআচরণ জারি থাকেনা।

সাইক্লোন আইলাতে যারা বাস্তুচ্যুত হয়ে বস্তিতে এসে বাস করতে বাধ্য হয়েছে তাদের প্রতি চল্লিশ জনকে একটি ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে হচ্ছে। ফলে, তাদের স্যানিটেশনের বিপদাপন্নতা আইলা আক্রান্ত এলাকার তুলনায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। শতকরা ৫৮ ভাগের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। শতকরা ২১ ভাগ ল্যাট্রিনের ওয়াটার সীল ভাঙ্গা এবং প্যান ও স্ল্যাব মাছিতে ভর্তি। অনেক ল্যাট্রিন আবার ড্রেনের সাথে সংযুক্ত এবং এখানে পাশের নোংরা পানিতে মল ভাসতে দেখা গেছে।

- Mehedi, H., Nag, A. K., & Farhana, S. (2010) Climate Induced Displacement Case Study of Cyclone Aila in the Southwest Coastal Region of Bangladesh, Humanitywatch, Khulna.

৪.৩.৩. প্রজনন স্বাস্থ্য

দুর্যোগের সময়ে নিরাপদ পানির অভাবের কারণে কিশোরী ও প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্যাভ্যাস চর্চায় সমস্যা হয়। ফলে তাদেরকে নানাবিধ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। গর্ভবতী মায়েদের পক্ষে এ সময় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি চর্চা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সম্ভব হয়না। এছাড়াও লবণাক্ত পানির কারণে তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে ও তারা চর্মরোগে ভোগে। পাশাপাশি দুর্যোগকালীন পরিবার প্রতি পৃথক পায়খানা না থাকায় কিশোরী, নারী ও গর্ভবতী মায়েদের অন্যত্র অন্যের পায়খানা ব্যবহার করতে হয় অথবা অপেক্ষাকৃত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বা যেখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয় যা তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উভয়ের জন্যই একটি বড় হুমকি।

> বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জলাবদ্ধতার কারণে গোসল করা ও পরিচ্ছন্ন থাকাই জনগোষ্ঠীর জন্য সব থেকে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় সবগুলো নারী দল জানিয়েছে যে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা যাচ্ছেনা। এ্যাসেসমেন্ট টিম জানিয়েছে যে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার উপকরণ, পানি আর নিরাপদ স্থান না থাকার কারণে নারীর পক্ষে ঋতুকালীন পরিচর্যা ঠিক মতো করা সম্ভব হচ্ছেনা। একটি টিম জানিয়েছে যে, শতকরা তিন জন নারী ময়লা পানি ব্যবহার করার কারণে ইনফেকশনে ভোগে ও তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়।
>
> - Emergency Capacity Building Project (2011) Flooding & Prolonged Water- logging in South West Bangladesh Coordinated Assessment Report

পঞ্চম অধ্যায়:

দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিশ্চয়তায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা ব্যবস্থাপনার বিবেচ্য বিষয়

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সেবা অধিকার হিসাবে স্বীকৃত ও মৌলিক চাহিদা হিসাবে গণ্য। বাস্তবক্ষেত্রে মূলত জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাহিদা নিরূপণ ও সেবা ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করা হয়। এই সেবা প্রদানের লক্ষ্যে যে জাতীয় নীতি ও কৌশল তৈরি করা হয়েছে তার চালিকায় রয়েছে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। তবে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অর্থনৈতিক পণ্যের আওতায় পড়ে। তাই, জাতীয় নীতি ও কৌশলের অভীষ্ট হলো নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা সহনীয় মূল্যে সকলের নাগালে আনা। এই সেবা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়া হবে, পাশাপাশি এতে বাণিজ্যিক ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট মাত্রায় অংশ নেবে।

৫.১. পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা বিষয়ে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

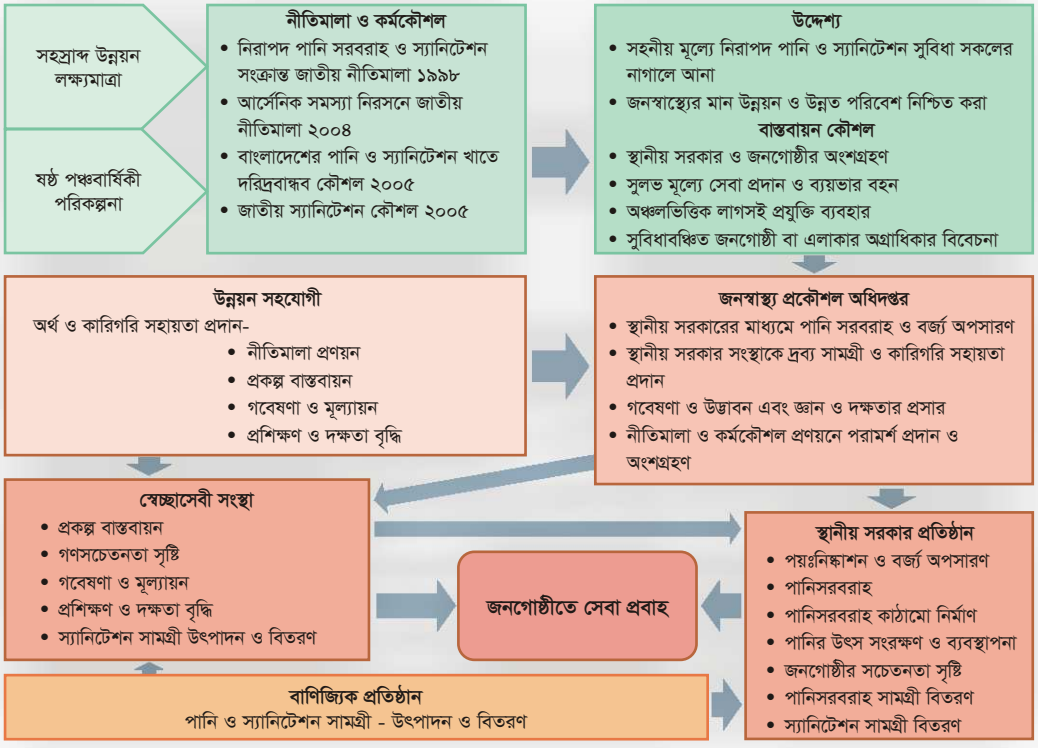

৫.১.১. সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের দায়িত্ব ও অংশগ্রহণ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনা দেওয়া ও জাতীয় কার্যক্রমের পরিধি নির্ধারণের জন্য কয়েকটি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। এর চালিকায় রয়েছে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। এই নীতিমালাগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের অভীষ্ট সার্বিক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্মসূচির রূপরেখা সম্পর্কে ধারণা দেয়। এরমধ্যে মূখ্য হলো জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতি ১৯৯৮ ও এর পরিপূরক আর্সেনিক সমস্যা নিরসনে জাতীয় নীতিমালা ২০০৪। সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নীতিমালার আলোকে 'বাংলাদেশের পানি ও স্যানিটেশন খাতে দরিদ্রবান্ধব কৌশল ২০০৫ ও 'জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল ২০০৫' প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় নীতি

জাতীয় নীতির উদ্দেশ্য হলো সহনীয় মূল্যে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা সকলের নাগালে আনা। নীতিগতভাবে পানি ও স্যানিটেশন মৌলিক চাহিদা হিসাবে গণ্য হয়েছে। তবে পানি একটি অর্থনৈতিক সম্পদ, সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এর উৎপাদন খরচ সেবামূল্য হিসাবে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে উসুল করা হবে। সেবা প্রদানে বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী খাত যুক্ত থাকবে। আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এতে উন্নয়ন সহযোগীর অংশগ্রহণ। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য সহযোগীরা হলো বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ডানিডা, জাইকা, সিডা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, এনজিও ফোরাম ও ওয়াটারএইড। এরা নীতিমালা প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অর্থ ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। পানি ও স্যানিটেশনের সাথে জড়িত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো সাধারণত দাতাদের অর্থ সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন, গণসচেতনতা সৃষ্টি, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ করে। তারা এই কাজগুলো সরাসরি জনগোষ্ঠীর সাথে করে; আবার, কখনও কখনও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে করে।

জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতি ১৯৯৮ এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলো-

- সকলের জন্য ন্যূনতম পানি ও স্যানিটেশন সুবিধার সার্বজনীন প্রাপ্যতা;
- পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে জনগণের আচরণগত পরিবর্তন;
- পানিবাহিত রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হ্রাস;
- পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলায় স্থানীয় সরকার ও জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি;
- টেকসই পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রসার;
- ভূ-উপরিস্থ পানির উপযুক্ত সংরক্ষণ, সঠিক ব্যবহার ও দূষণ রোধ;
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

উপরন্তু, অনেক এনজিও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে স্যানিটেশন সামগ্রী, যেমন- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার জন্য রিং ও স্ল্যাব তৈরি এবং বিতরণ করে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা সচল রাখতে বাজার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বস্তুত, এই সেবা প্রদানে যত রকমের সামগ্রী বা উপরকরণ দরকার হয় তার প্রায় সবটাই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তৈরি হয়। এগুলো প্রচলিত বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর কাছে

পৌঁছায়। এমনকি, এনজিও, অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার সংস্থা যেসব সামগ্রী ভর্তুকি বা বাজারদামে বিতরণ করে সেগুলোও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কেনা।

প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালা বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের। মন্ত্রণালয় এই দায়িত্ব স্থানীয় সরকার বিভাগের উপর ন্যস্ত করেছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনসম্পর্কিত সামগ্রিক পরিকল্পনা, প্রকল্প নির্ধারণ ও ব্যবহারকারীপর্যায়ে সেবা প্রদান এর আওতাধীন পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ওয়াসা) ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করে।

এসব সংস্থার প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব পালন করে; স্থানীয় সরকার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো নিয়ে গঠিত একটি ফোরামের মাধ্যমে চলমান কার্যক্রমের সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ডিপিএইচই মেট্রোপোলিটন শহর বাদে দেশের বাকি সব এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের দায়িত্ব পালন করে। এ বিষয়ে ডিপিএইচই এর দায়িত্ব হলো পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনে অবকাঠামো নির্মাণে সাহায্য করা ও কারিগরি সহায়তা দেওয়া। এর পাশাপাশি গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই ডিপিএইচই বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই কাজের জন্য ডিপিএইচই এর উপজেলা পর্যন্ত সকল স্তরে কাঠামো ও জনবল রয়েছে।

২০০৯ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন দ্বারা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান ও এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। তবে ইউনিয়ন পরিষদের এ বিষয়ে দক্ষতা বা সক্ষমতা তেমন গড়ে উঠেনি। ফলে, ডিপিএইচই এখন পর্যন্ত ইউনিয়ন পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

৫.১.২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব

দুর্যোগকালে খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা সচল রাখা আরো জরুরি হয়ে পড়ে। এই সেবা থেকে বঞ্চিত হলে দুর্যোগাক্রান্ত জনগোষ্ঠী রোগব্যাধির কবলে পড়তে পারে ও এতে তারা আরও বেশি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এসওডি এর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত কিছু দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। দুর্যোগের আগে, দুর্যোগকালে ও দুর্যোগের পরে ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও জরুরি সেবা ও পুনর্বাসনমূলক যে কাজগুলো জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের দায়িত্বের আওতায় পড়ে তার মধ্যে রয়েছে -

দুর্যোগের আগে- কমিউনিটি কন্সালটেশনের মাধ্যমে এই খাতে ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করা। অন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সাথে যৌথভাবে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা করা। দুর্যোগের সময় সম্ভাব্য জরুরি কাজের জন্য প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া; যেমন- যন্ত্রপাতি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ব্লিচিং পাউডার ও অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য নলকূপ ও ল্যাট্রিনের মজুত রাখা।

দুর্যোগকালে- জরুরি ভিত্তিতে নলকূপ মেরামত করা, আশ্রয়কেন্দ্রে নলকূপ ও ল্যাট্রিন বসানো, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ব্লিচিং পাউডার সরবরাহ ও জরুরি ভিত্তিতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

দুর্যোগের পরে- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে একযোগে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য পুনর্বাসনের কাজ। এরমধ্যে নলকূপ মেরামত, নতুন নলকূপ ও ল্যাট্রিন বসানো ও পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্লিচিং পাউডার সরবরাহ পড়ে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের দায়িত্ব ও কাজ

- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম শহর বাদে দেশের বাকি সব গ্রাম ও নগরাঞ্চলে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা ইত্যাদি) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা (মল-মূত্র অপসারণ, পানি নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা)।
- নগরাঞ্চলে এককভাবে অথবা পৌরসভার সাথে যৌথভাবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান। পাশাপাশি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোকে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে সাহায্য করে ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম চালু রাখা ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে কারিগরি সহায়তা প্রদান।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা এবং অবকাঠামোসমূহের প্রয়োজনীয় ও টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য জনসম্পদ বিভাগের মাধ্যমে যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে সব স্তরে পরীক্ষাগার স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী পানির গুণাগুণ পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
- নিরাপদ পানির উৎস (ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ) খুঁজে পেতে জল-ভূতত্ত্বীয় অনুসন্ধান পরিচালনা।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যবিধিচর্চা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
- আর্সেনিককবলিত অঞ্চল ও অন্যান্য সমস্যা কণ্টকিত এলাকার (লবণাক্ত অঞ্চল, পাথুরে এলাকা, পাহাড়ি এলাকা) জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহের যথাযথ প্রযুক্তি বের করা।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের লোকজ পদ্ধতিসহ লাগসই ও সাশ্রয়ী উপায় খুঁজে পেতে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ করা।
- দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত করা।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত জাতীয় তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা ।
- প্রযুক্তি, তথ্য ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনগোষ্ঠী, এনজিও, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি।
- স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের (এনজিও এবং নানাবিধ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান) কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয় করা।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা।

তথ্যসূত্র: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর http://www.dphe.gov.bd

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগে সাড়া প্রদানমূলক কাজ। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানো, সেবাগুলো চলমান রাখা, আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো ও তাদের দুর্দশা লাঘব করা। এরজন্য এই কমিটি ঝুঁকি বিশ্লেষণ করবে ও ঝুঁকি নিরসনমূলক কর্মসূচি নেবে; দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করবে এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে অংশ নেবে। দুর্যোগের আগে, দুর্যোগকালে ও দুর্যোগের পরে এই কমিটি যে কাজগুলো করবে তার মধ্যে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত দায়িত্বগুলো হলো-

দুর্যোগের আগে- কমিউনিটি পর্যায়ে ঝুঁকি বিশ্লেষণের সময় পানি ও স্যানিটেশনের ঝুঁকিগুলো বিশেষভাবে চিহ্নিত করা ও সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিহ্রাস কাজগুলোর পরিকল্পনা করা। জনগোষ্ঠীতে পানি ও স্যানিটেশনের ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নিরসন আচরণ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। দুর্যোগকালে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সচল রাখার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে প্রস্তুতিমূলক কাজ করা।

দুর্যোগকালে- ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের সময় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত ক্ষতি ও চাহিদাগুলো নিরূপণ করা। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় জরুরি ভিত্তিতে নলকূপ মেরামত করা, আশ্রয়কেন্দ্রে নলকূপ ও ল্যাট্রিন বসানো, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ব্লিচিং পাউডার সরবরাহ ও জরুরি ভিত্তিতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

দুর্যোগের পরে- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য পুনর্বাসনের কাজ। যেমন- নলকূপ মেরামত, নতুন নলকূপ ও ল্যাট্রিন বসানো ও পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্লিচিং পাউডার সরবরাহ করা।

ইউনিয়ন পরিষদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক কার্যাবলী

- গোবর ও রাস্তার আবর্জনা সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- কুয়া, পানি তোলার কল, জলাধার এবং পানি সরবরাহের অন্যান্য উৎসের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ।
- খাবার পানির উৎসের দূষণ রোধ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সন্দেহযুক্ত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানের পানি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
- খাবার পানির জন্য সংরক্ষিত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে গোসল, কাপড় কাঁচা বা পশু গোসল করানো নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।
- পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থান বা নিকটবর্তী স্থানে শন, পাট বা অন্যান্য গাছ ভিজানো নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, অক্টোবর ১৫, ২০০৯, দ্বিতীয় তফসিল, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী

৫.২ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কৌশল

জলবায়ু পরিবর্তন পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে, আর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দুর্যোগ আরও বেশিমাত্রায় ও পৌনঃপুনিক ক্ষয়ক্ষতি করছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর আর নির্ভর করা যাচ্ছেনা। নলকূপ ক্রমেই অচল হয়ে পড়ছে; প্রচলিত রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন অনেক ক্ষেত্রেই কাজে আসছেনা। পানি ও স্যানিটেশন ক্রমেই ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা এখন আগের তুলনায় কঠিন হয়ে উঠছে।

জনশিক্ষা ও গণসচেতনতা সৃষ্টির কাজে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটি ওয়ার্ড ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (WDMC)-এর অন্যতম প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো-

- নতুন প্রযুক্তি যদি দরকার হয় তাহলে তার ব্যবহারবিধি শেখানো ও এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন করা; যেমন, নলকূপের বদলে বৃষ্টির পানি ব্যবহার হলে তা কেমন করে করতে হবে শেখানো অথবা পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা কী হতে পারে সে বিষয়ে সচেতন করা।
- পরবর্তী পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধিচর্চায় ব্যক্তিগত আচরণে কী পরিবর্তন আনতে হবে তা শেখানো; যেমন, কিভাবে স্বল্প পানি ব্যবহারে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা যায়।
- সামাজিক আচরণে কী পরিবর্তন দরকার হবে সে বিষয়ে জনগোষ্ঠীকে সচেতন করা; যেমন, ঘন বসতি এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের কাঠামো বা অবস্থান কী হতে পারে।

৫.২.১. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিশ্চয়তা ব্যবস্থাপনা কৌশল

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা সচল রাখার জন্য যে কৌশল নেওয়া যেতে পারে তার মধ্যে রয়েছে-

উপযুক্ত ও কার্যকর প্রযুক্তি ব্যবহার- এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা নিশ্চিত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উপযুক্ত ও কার্যকর প্রযুক্তি খুঁজে পাওয়া। পানির বর্তমান উৎস ও বিদ্যমান প্রযুক্তিগুলো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কতটুকু কাজ করবে তা জানা দরকার। পানির বর্তমান উৎস যদি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে আর প্রচলিত প্রযুক্তি যদি তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে তাহলে নতুন উৎস ও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত উপযুক্ত প্রযুক্তি খুঁজে পেতে হবে। তথ্য, জ্ঞান ও গবেষণার মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। নতুন প্রযুক্তি সরবরাহ ও বিতরণের সাথে এর উৎপাদন সংক্রান্ত কারিগরি দক্ষতা ও অর্থনৈতিক বিষয় জড়িত। তাছাড়া, এর ব্যবহারবিধিও জনগোষ্ঠীকে শিখে নিতে হবে।

অনিশ্চয়তা ব্যবস্থাপনার কৌশল

- উপযুক্ত ও কার্যকর প্রযুক্তি ব্যবহার;
- সেবামূল্যের মাধ্যমে ব্যয়ভার বণ্টন;
- গণসচেতনতার মাধ্যমে চাহিদা সৃষ্টি;
- দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য ভর্তুকি;
- জবাবদিহিতা ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ;
- 'সরকারি-বেসরকারি-স্বেচ্ছাসেবী' অংশিদারিত্ব।

সেবামূল্যের মাধ্যমে ব্যয়ভার বণ্টন- দুর্যোগ ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রায় অনিবার্যভাবে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ব্যয়ভার বেড়ে যাবে। ব্যয়ভার বণ্টন ছাড়া এই সেবা নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেওয়া সম্ভব হবেনা। সেবামূল্যের মাধ্যমে ব্যয়ভার বণ্টনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গণসচেতনতার মাধ্যমে চাহিদা সৃষ্টি- পানি ও স্যানিটেশনের খরচ বৃদ্ধি পরিবার ও ব্যক্তি পর্যায়ে চাহিদার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে, কম সচ্ছল পরিবারের ক্ষেত্রে এই চাহিদা অগ্রাধিকার হারাতে পারে। তাই, জনশিক্ষা ও গণসচেতনতার মাধ্যমে সকলকে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহারে আগ্রহী করে তোলা ও এর চাহিদা সৃষ্টি করা বিশেষ জরুরি।

দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতের জন্য ভর্তুকি- দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর জন্য এই ব্যয় বহন করা স্বাভাবিকভাবেই কষ্টসাধ্য। তাই নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তনের সাথে সাথে সকলের প্রবেশগম্যতার বিষয়টি দেখাও জরুরি। তাই আর্থসামাজিক অবস্থার পার্থক্য বিবেচনায় নিয়ে এই সেবার মূল্য নির্ধারণ করা জরুরি। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে দরিদ্র পরিবারগুলো আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এই সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়ে পড়ে। দরকার হলে দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত পরিবারগুলোকে ভর্তুকি মূল্যে বা বিনামূল্যে সেবা দেওয়া যেতে পারে। তাছাড়া, নারী ও পুরুষের চাহিদা ও প্রবেশগম্যতার পার্থক্য বিবেচনা করা জরুরি। প্রযুক্তিগত জটিলতা বা বিতরণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে নারী ও পুরুষের প্রবেশগম্যতায় যেন বৈষম্য না ঘটে।

জবাবদিহিতা ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ - নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার ক্ষেত্রে প্রধান কাজ হলো:

ক) কার্যকর প্রযুক্তি, দরকার হলে নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসা
খ) সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্ন রাখা এবং
গ) জনশিক্ষা ও গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কার্যক্রম চালানো।

এসব কাজে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে ভালোভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রেই জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ থাকতে হবে। এটি জাতীয় পর্যায়ের কাজ; জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের দায়িত্ব। তবে, এ বিষয়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (WDMC) বিদ্যমান প্রযুক্তির অসুবিধাগুলো ও নতুন প্রযুক্তির নির্ণায়ক কী হবে তা জানাতে পারে। এর জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করতে হবে।

সরকারি-বেসরকারি-স্বেচ্ছাসেবী অংশিদারিত্ব- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ এবং বিতরণ কাজে অংশ নিতে হবে। দুর্যোগ ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত জটিল ও ব্যয়বহুল প্রযুক্তি দরকার হয়ে পড়ছে। সকলের জন্য মানসম্মত ও প্রয়োজনমতো সেবা প্রদানের জন্য যথেষ্ট বিনিয়োগ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সরবরাহ চেইন নিশ্চিত করা কোন একক প্রতিষ্ঠানের জন্য দুরূহ। ফলে সরকারি-বেসরকারি-স্বেচ্ছাসেবী অংশিদারিত্বের মাধ্যমে এই প্রদানের ব্যবস্থা করা জরুরি।

ওয়াটারএইড এ্যাপ্রোচ

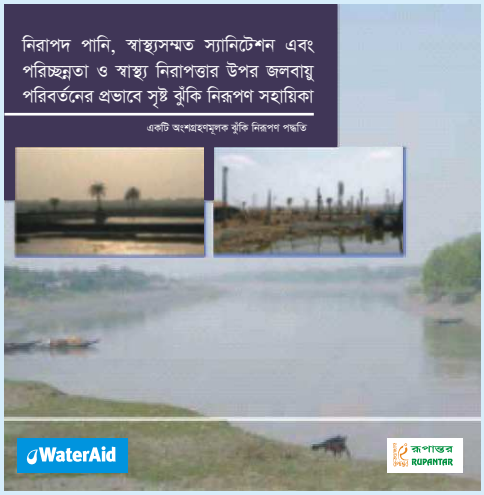

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পূর্ণরূপে কমিউনিটি ভিত্তিক বটম-আপ পদ্ধতি, এতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মুখ্য ভূমিকা থাকে। বিদ্যমান স্থানীয় সরকার কাঠামোতে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এই ধরণের কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা নেই। ফলে তৃণমূল পর্যায়ের চাহিদা ও প্রতিকূলতা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিফলিত হয়না। তাছাড়া, কমিউনিটিভিত্তিক কার্যক্রম স্বল্পমেয়াদি প্রকল্পভিত্তিক হয়ে থাকে, এগুলো দীর্ঘমেয়াদি বা টেকসই ব্যবস্থা নিতে পারেনা। এসব বিবেচনা করে, নতুন এ্যাপ্রোচে ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে; এই কমিটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে। এই কমিটির নাম হবে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি; প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় এই কমিটি চালকের ভূমিকা গ্রহণ করবে।

ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পাশাপাশি ইনফর্মাল কমিউনিটি গ্রুপ (যেমন, মাদার্স ক্লাব, এডোলিসেন্ট ক্লাব, ইউথ ক্লাব, প্রফেশনাল ক্লাব ইত্যাদি) গঠন করা হবে ও এগুলোর সাথে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা যুক্ত থাকবেন। এইসব ক্লাবের কাজ হবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা, নতুন জ্ঞান প্রচার করা ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা প্রসার করা। এছাড়াও, এরা ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এ সহায়তা দেবে। ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় পর্যায়ে ওয়াস সার্ভিস কভারেজ মূল্যায়নের পদ্ধতি হিসাবে জনগোষ্ঠীর সাথে মিলিতভাবে পার্টিসিপেটরি ওয়াস ভালনারেবিলিটি এ্যাসেসমেন্ট (পিডব্লিউভিএ) পরিচালনা করবে। প্রচলিত পার্টিসিপেটরি রুরাল এ্যাপ্রাইজাল ও পার্টিসিপেটরি ভালনারেবিলিটি এ্যাসেসমেন্ট এর ভিত্তিতে পিডব্লিউভিএ তৈরি হয়েছে। ঐ দু'টি পদ্ধতির সমন্বয়ে পিডব্লিউভিএ, স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টিকোণের বদলে জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াস পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান উপাদান হলো পিডব্লিউভিএ, তাই প্রকল্পের প্রাথমিক কার্যাবলিতে পিডব্লিউভিএ এ অন্তর্ভূক্ত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ- জনগোষ্ঠীকে ওয়াস সেবা দাবী করা ও কোথায় সম্পদ ব্যবহার করা হবে তা নির্ধারণ করার এখতিয়ার দেওয়া হয়। এ্যাসেসমেন্ট প্রক্রিয়া জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি সম্পর্কিত জ্ঞান আদানপ্রদান করার সুযোগ দেয়। এতে প্রক্রিয়া ও ফলাফলের উপর জনগোষ্ঠীর মালিকানা গড়ে ওঠে, ফলে পরিবার ও জনগোষ্ঠী কার্যক্রম নির্ধারণে বেশি দায়িত্বশীল হয়।

আশা করা যাচ্ছে যে, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনা করে ডব্লিউডিএমসি অভিযোজনের জন্য কর্মপরিকল্পনা করবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডব্লিউডিএমসির সক্ষমতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত হবে। প্রত্যেক ইউডিএমসি তাদের নয়টি ওয়ার্ডের বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে। এই কর্মপরিকল্পনাতে কাজের বিস্তারিত বিবরণ, দায়িত্ব বণ্টন, সম্পদ সংগ্রহ ও সময়সূচি উল্লেখ থাকবে। এভাবে, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৫.২.২. অনিশ্চয়তা ব্যবস্থাপনার মূলনীতি

দুর্যোগ ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিশ্চয়তায় পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা ব্যবস্থাপনা কৌশলের নীতিকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো-

দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি - দুর্যোগঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে চলমান প্রকল্প বা বিদ্যমান ব্যবস্থা আগামীতে কতটা কার্যকর থাকবে তা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হচ্ছেনা। তাই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সম্পর্কিত কার্যক্রম অনড় বা স্থায়ী হলে চলবেনা। আবশ্যিক ও জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য যেসব পরিকল্পনা নেওয়া হবে তা দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে। এর ভিতর পরিবর্তনশীলতার উপাদান থাকতে হবে যাতে অনির্ধারিত পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব হয়।

বিবিধ উৎস বা প্রযুক্তির সমন্বয় - জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অনেকক্ষেত্রেই প্রচলিত পানির উৎস বা প্রযুক্তি তাদের কার্যকারিতা হারাচ্ছে। যেমন, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। এগুলো আর কতদিন নির্ভরযোগ্য থাকবে তা অনিশ্চিত; এবং এক ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায় রূপান্তর সময় সাপেক্ষ। তাই, এককভাবে পানির কোন উৎসের উপর সামগ্রিকভাবে নির্ভরশীল না হয়ে বহুবিধ উৎস ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়; যেমন, শুধুমাত্র ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভর না করে, এর সাথে বৃষ্টির পানিও ব্যবহার করা; অনুরূপভাবে, নলকূপের সাথে সাথে রিভার্স অসমোসিস মেশিন (লবণ মুক্তকরণ প্রযুক্তি) ব্যবহার করা অথবা প্রচলিত রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিনের সাথে অন্যান্য ধরণের ল্যাট্রিন ব্যবহার করা।

নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার - জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে কোন কোন বহুল প্রচলিত প্রযুক্তি এখন আর চাহিদা মেটাতে পারছেনা; যেমন, লবণদূষণ এলাকায় প্রচলিত নলকূপ বা পিএসএফ। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদা মেটানোর জন্য, পুরনো বা প্রচলিত প্রযুক্তিতে আরও বিনিয়োগ না করে, যথাযথ প্রযুক্তি ও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা বেশি কার্যকর। যেমন, লবণ দূষণ এলাকায় প্রচলিত নলকূপ বা পিএসএফ এর বদলে রিভার্স অসমোসিস মেশিন (লবণ মুক্তকরণ প্রযুক্তি) অথবা বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।

অঞ্চল ভিত্তিক ব্যবস্থা - দুর্যোগ ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাগুলো অঞ্চল ভিত্তিক ভিন্নরূপে দেখা দিচ্ছে; যেমন, উপকূল অঞ্চলে লবণদূষণ, নদী অববাহিকা ও চর অঞ্চলে কম পানি-বেশি পানির চক্র। ফলে, কোন একক প্রযুক্তি (যেমন- নলকূপ) বা পানির বিশেষ কোন প্রাকৃতিক উৎস সকল অঞ্চলের জন্য কাজে আসবেনা। তাই, অঞ্চল ভিত্তিক উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

সকলের জন্য সুযোগ - জলবায়ু পরিবর্তন ও পৌনঃপুনিক দুর্যোগ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার ক্ষেত্রে যে ঘাটতি সৃষ্টি করছে তার ফলে প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে বঞ্চনা ও বৈষম্য বাড়ছে। মৌলিক চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে এ ধরণের বঞ্চনা বা বৈষম্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাই, প্রযুক্তি বা বিতরণ ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে সকলেই পানি পেতে পারে ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারে। পানি সংগ্রহে নারীর যেন কোন রকমের ঝুঁকি না থাকে; এবং প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী, শিশু বা বৃদ্ধ যেন সহজেই প্রয়োজনমত পানি পেতে পারে বা স্যানিটেশন সেবা ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া দুর্গম ও প্রান্তিক এলাকায় বাসরত জনগোষ্ঠীও যেন এই সেবার আওতায় আসে।

সকলের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে - পানি ও স্যানিটেশন সেবা মৌলিক চাহিদা হলেও এর অর্থমূল্য রয়েছে। জাতীয়ভাবে অর্থমূল্যের বিনিময়ে এই সেবা বিতরণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু করার জন্য অবধারিতভাবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবার খরচ বেড়ে যাবে এবং এই বর্ধিত ব্যয়ের ভার ব্যবহারকারীর উপরই বর্তাবে। তাই, বিতরণ ব্যবস্থা ও সেবার মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে হতদরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত পরিবারগুলো প্রয়োজনমত পানি পেতে পারে বা স্যানিটেশন সেবা ব্যবহার করতে পারে। এর জন্য দরকার হলে শ্রেণীভিত্তিক সেবামূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা - বহুল প্রচলিত বা প্রথাগত কোন কোন প্রযুক্তি বা ব্যবস্থা এখন আর তেমন কাজে আসছেনা, যেমন- ঘন বসতি এলাকায় রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন। তাই, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলায় নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশনের জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। যেমন, পানি বিতরণকেন্দ্র এমনস্থানে হতে হবে যাতে সেখানে যাওয়া নারীর জন্য মর্যাদাহানিকর না হয়; অথবা নতুন প্রযুক্তির পায়খানার কাঠামো ও ব্যবহারবিধি এমন হতে হবে যাতে সকলের কাছেই এগুলো গ্রহণীয় হয়। তবে, বৈষম্যমূলক বা নেতিবাচক কোন প্রচলিত প্রথা যদি সমস্যা সমাধানে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে প্রথমেই জনশিক্ষার মাধ্যমে তা সকলের কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে হবে।

জবাবদিহিতা - দুর্যোগঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অনিশ্চয়তার কারণে বর্তমান বিনিয়োগ বা চলমান প্রকল্প ভবিষ্যতে কতটা লাভ বা ক্ষতি বয়ে আনবে তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, বাস্তব কারণে চলমান প্রকল্পে পরিবর্তন আনা দরকার হতে পারে। তাই, প্রকল্পের সফলতা-বিফলতার দায়ভার এবং পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কার কী দায়িত্ব তা নির্ধারণ করার জন্য জবাবদিহিতার কাঠামো ও প্রক্রিয়া থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

৫.২.৩. পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা বিষয়ে বিবেচ্য

পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার মূলনীতির পাশাপাশি, ক্ষেত্র বিশেষে কিছু বিবেচ্য বিষয় রয়েছে। এগুলো হলো-

নিরাপদ পানি

- পানির গুণাগুণ ও মাথাপিছু পরিমাণ নির্ধারণ ও তা নিশ্চিত করা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। পানি অবশ্যই নিরাপদ হতে হবে, অর্থাৎ ময়লা, আবর্জনা, ক্ষতিকর খনিজ ও রাসায়নিক পদার্থমুক্ত এবং সর্বোপরি জীবাণুমুক্ত হতে হবে; আর এর সরবরাহ ব্যবস্থা হতে হবে এমন যাতে সকলে প্রয়োজনমত পানি পায়।
- পানি সংগ্রহের জন্য নারীকে যেন বেশি দূরে না যেতে হয় বা তার কাজের বোঝা বেশি বেড়ে না যায় তা নিশ্চিত করা জরুরি। তাছাড়া, পানি সংগ্রহের জন্য নারী যেন কোন হয়রানির শিকার না হয় এবং সে যেন নিজের মর্যাদা বজায় রাখতে পারে।

বেঁচে থাকার জন্য পানির ন্যূনতম চাহিদা		
খাবার পানির ন্যূনতম চাহিদা (পান ও রান্নার জন্য)	২.৫ থেকে ৩ লিটার/প্রতিদিন/ জনপ্রতি	নির্ভর করে স্থানীয় জলবায়ু ও শারীরিক গঠনের উপর
মৌলিক স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য	২ থেকে ৬ লিটার /প্রতিদিন/ জনপ্রতি	সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথার উপর নির্ভর করে
রান্নার জন্য	৩ থেকে ৬ লিটার /প্রতিদিন/ জনপ্রতি	খাদ্যের ধরণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথার উপর নির্ভর করে
পানির সামগ্রিক চাহিদা	৭.৫ থেকে ১৫ লিটার/প্রতিদিন/জনপ্রতি	

তথ্যসূত্র: মানবিকতার ঘোষণাপত্র ও দুর্যোগে সাড়া দেয়ার ন্যূনতম মান (স্ফিয়ার প্রজেক্ট), ২০১১

স্যানিটেশন

- প্রযুক্তি ও অবকাঠামো আর এদের প্রয়োগ পদ্ধতি এমন হতে হবে যাতে পরিবেশ দূষণ রোধ হয় ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার ব্যবহার রোগ-বিস্তার রোধ করে।
- স্যানিটেশন ব্যবস্থা সকলের জন্য সুলভ; সংস্কৃতিগতভাবে গ্রহণীয় ও ব্যবহারকারীর মর্যাদা রক্ষা, বিশেষ করে, নারীর মর্যাদা রক্ষার বিষয়গুলোও বিবেচনা করা জরুরি ।
- প্রযুক্তি ও অবকাঠামো টেকসই আর এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিবারের নাগালের মধ্যে থাকা দরকার।
- লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে পরিবার পিছু একটি ল্যাট্রিন। ঘন বসতি এলাকায় এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দরকার হলে লাগসই প্রযুক্তি খুঁজে বের করতে হবে।

স্বাস্থ্যবিধিচর্চা

- স্বাস্থ্যবিধি চর্চার মুখ্য বিষয় হলো সু-আচরণের মাধ্যমে রোগের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো আর রোগব্যাধির বিস্তার রোধ করা। এ সম্পর্কে বিধিবদ্ধ জ্ঞান জানা ও সকলকে জানানো এবং এর ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক আচরণ পরিবর্তন করে রোগব্যাধির প্রকোপ কমানো। জনশিক্ষা ও সচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে এটা করা সম্ভব।

৫.২.৪. সম্পদ সমাবেশ

সম্পদ বলতে সাধারণভাবে অর্থ বা টাকা-পয়সা বোঝায়। প্রকৃতপক্ষে সম্পদের মধ্যে রয়েছে সামগ্রী, প্রযুক্তি আর মানব সম্পদ। অর্থের বিনিময়ে এগুলো সংগ্রহ করা হয়। তবে অনেক সময় টাকা-পয়সা থাকলেও প্রয়োজনীয় সম্পদ সময়মত জোগাড় করা যায়না। এই কারণে কী সম্পদ প্রয়োজন ও কেমনভাবে পাওয়া যাবে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা বিশেষ দরকার।

পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান কাজ হলো গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। এই কাজ করার জন্য সম্পদ লাগবে। আর এই সম্পদের বড় অংশই হলো মানব সম্পদ। পরিমাণগতভাবে মানব সম্পদ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। তবে জনগোষ্ঠী থেকে সরাসরি দক্ষ মানব সম্পদ পাওয়া যায়না। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এর দক্ষতা সৃষ্টি করতে হয়। এর

জন্য দরকার হবে কিছু বস্তুগত সম্পদ ও প্রযুক্তি। এটিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বা এই খাতে নিয়োজিত এনজিওর কাছে চাইতে পারে। আর্থিক সহায়তা পেতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। এই পরিকল্পনায় কাজগুলো কী আর কোন কাজের কী পরিমাণ ও কী ধরণের সম্পদ লাগবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

এই খাতে যেসব সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা জড়িত তারা আর্থিক সহায়তা দিতে পারে। তাই সব থেকে জরুরি বিষয় হলো এদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা ও তাদের বিশ্বস্ততা অর্জন করা। এদের কাছ থেকে সহায়তা পেতে হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে খুবই স্পষ্ট করে দেখাতে হবে-

- পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি চর্চার কাজগুলো কী এবং প্রদেয় অর্থ বা সম্পদ কোন কাজে ও কিভাবে ব্যবহার হবে।
- প্রস্তাবিত কাজগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে আর এটি করার জন্য তার যথেষ্ট সক্ষমতা রয়েছে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রণালী যথেষ্ট স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক।

৫.৩. জবাবদিহিতা

জবাবদিহিতা হলো দায়িত্বশীলতার সাথে ক্ষমতা ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা। জবাবদিহিতার মূল বিষয় হলো সকলকে কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো, সকলের মতামত নেওয়া এবং অভিযোগ গ্রহণ ও তার নিষ্পত্তি করা।

জবাবদিহিতার লক্ষ্যমাত্রা

তথ্য সরবরাহ

- আর্থিক বিষয়সহ, কর্মসূচি সম্পর্কিত সব তথ্য এমনভাবে প্রকাশ করা যাতে নারী-পুরুষ বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সবাই তা বুঝতে পারে।
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচসহ সকল তথ্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা; নিয়মিত কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকাশ করা; এবং তথ্য প্রকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনা করা।

অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

- স্থানীয় জনগোষ্ঠী সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুখ্য ভূমিকা নেবে ও প্রকল্পের অংশীদারিত্ব অনুভব করবে।
- নারীসহ দরিদ্র ও প্রান্তিক লোকের চাহিদা আমলে নেওয়া হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা।
- বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেকার বিবাদ বা দলাদলি বিবেচনায় নেওয়া ও সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে তার মিমাংসা করা।

ফিডব্যাক প্রণালী

- স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনা করে এমনভাবে মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা যাতে নারী ও প্রান্তিক লোকজন নির্ভয়ে অভিযোগ করতে বা মতামত জানাতে পারে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নিয়মিত জনগোষ্ঠীর সন্তুষ্টির মাত্রা মনিটর করতে পারে।

আচরণ

- স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ জনগোষ্ঠীর সাথে পারস্পরিক আস্থা ও সম্মানের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তুলবে।
- জনগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও আলোচনার মাধ্যমে নতুন নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা খুঁজে দেখা হবে।

সূত্রঃ The Listen First Framework: http://www.listenfirst.org/materials; Handout, ALNAP Training - Leadership in Action

৫.৩.১.জবাবদিহিতার কাঠামো

জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হলে এর একটি কাঠামো ও প্রক্রিয়া থাকতে হবে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যা করতে পারে তা হলো-

জবাবদিহিতার কাঠামো	
জনগোষ্ঠীকে জানানো	▪ কী তথ্য দেওয়া হবে ▪ কখন কখন তথ্য বিতরণ করা হবে ▪ তথ্য বিতরণের মাধ্যম ও প্রক্রিয়া কী হবে ▪ কারা তথ্য পাবে
জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে জানা	▪ কর্মসূচির কোন কোন পর্যায়ে তাদেরকে জানাতে হবে ▪ কোন কোন বিষয়ে জানাতে হবে ▪ কার মাধ্যমে জানাতে হবে ▪ জানানোর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কী হবে ▪ প্রাপ্ত তথ্য কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে
মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ	▪ কর্মসূচির কোন কোন পর্যায়ে অভিযোগ গ্রহণ করা হবে ▪ কোন কোন বিষয়ে অভিযোগ করা যাবে ▪ অভিযোগ করার পদ্ধতি কী হবে ▪ কিভাবে অভিযোগ আমলে নেওয়া ও নিষ্পত্তি করা হবে ▪ অভিযোগ নিষ্পত্তি সম্পর্কে কিভাবে ফিডব্যাক দেওয়া হবে

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের চলমান ও ভবিষ্যত কর্মসূচি সম্পর্কে সবাইকে জানানো। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা সম্পর্কিত কর্মসূচি কী এবং এতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর কী ভূমিকা রয়েছে তা জানানো। এছাড়া, কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে জানানো; যেমন- কাজগুলো কী ও এগুলো করার প্রক্রিয়া কী হবে ও কতদিন চলবে, এতে কী সম্পদ ব্যবহার হবে বা কত খরচ হবে আর এই সম্পদ কোথা থেকে এবং কিভাবে জোগাড় হবে বা হয়েছে; কার্যক্রমের অগ্রগতি কতদূর এবং এতে কী বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করতে হয়েছে।
- জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা সম্পর্কিত সমস্যা ও চাহিদাগুলো জানা। এছাড়াও, কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে, যেমন- অবস্থা বিশ্লেষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন,

বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে জনগোষ্ঠীর মতামত ও পরামর্শ নেওয়া। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এর জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। আর এর প্রক্রিয়া এমন হতে হবে যাতে জনগোষ্ঠীর সব স্তরের ও সব শ্রেণির লোক অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বিশেষ করে এতে নারী, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির লোকের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকা জরুরি।

- অভিযোগ গ্রহণের ও তা আমলে নেওয়া জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে কারো কোন মতামত বা এ বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে তারা যেন তা জানাতে পারে, এরজন্য একটি ব্যবস্থা থাকতে হবে। জনগোষ্ঠীর যে কেউ মতামত দিতে বা অভিযোগ জানাতে পারবে এবং কোন মতামত বা অভিযোগ পাওয়া গেলে তা আমলে নেওয়া হবে।

পরিশিষ্ট: পরিভাষা

অভিযোজন

অভিযোজন হচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানো। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, সে পরিস্থিতি উত্তরণে গৃহীত কৌশলকে জলবায়ু ঝুঁকি অভিযোজন বলা হয়।

আকস্মিক বন্যা

উজানে অতি বৃষ্টির ফলে পাহাড়ি ঢল বা নদীর পানির উচ্চতা হঠাৎ করে বেড়ে যে বন্যার সৃষ্টি হয় তাকে আকস্মিক বন্যা বা Flashflood বলে। সাধারণত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাসে বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়।

আপদ

আপদ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা, যা প্রাকৃতিক, মানব সৃষ্ট বা কারিগরি ত্রুটির কারণে ঘটতে পারে এবং যা মানুষের জীবন ও জীবিকার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাকৃতিক আপদের মধ্যে– সাইক্লোন, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, খরা, নদীভাঙ্গন; মানবসৃষ্ট আপদের মধ্যে– ভবনধ্বস, নৌ-দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড, সড়ক দুর্ঘটনা; ও কারিগরি আপদের মধ্যে– পারমাণবিক দুর্ঘটনার নাম বলা যেতে পারে। 'আপদ দুর্যোগ নয়, বরং দুর্যোগের সম্ভাব্য কারণ'। ভূমিকম্প একটি আপদ, এর কারণে প্রাণহানি সহ অন্যান্য অবকাঠামো ধ্বংসের মাধ্যমে দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। মৃদু-ভূকম্পন আপদ কিন্তু এতে দুর্যোগ দেখা দেয়না।

আবহাওয়া

একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমন্ডলের উপাদানসমূহের স্বল্প কয়েক দিনের গড় বা ১ থেকে ৭ দিনের গড় ফলকে আবহাওয়া বলা হয়। বায়ুমন্ডলের উপাদান বলতে বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ু প্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘের পরিমাণ ও মেঘের প্রকারভেদ এবং বৃষ্টিপাত ইত্যাদিকে বোঝায়।

আর্সেনিক

আর্সেনিক হলো এক ধরণের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ। আর্সেনিক সব সময়ই কোনো না কোনো পদার্থের সঙ্গে যৌগ রূপে বিরাজ করে। একদিকে অক্সিজেন, গন্ধক, ক্লোরিন, কার্বন ও হাইড্রোজেনের সঙ্গে এবং অন্যদিকে সিসা, পারদ, সোনা ও লোহার সঙ্গে যৌগ রূপে আর্সেনিক অবস্থান করে। প্রকৃতির প্রায় সর্বত্রই, যেমন– মাটি, পানি, বাতাস, সামুদ্রিক মাছ, খাদ্যশস্য, শাক-সব্জি ইত্যাদিতে বিভিন্ন মাত্রায় আর্সেনিক থাকে। কঠিন অবস্থায় এর বর্ণ সাদা বা হালকা ধূসর বর্ণের হয় এবং খুব সামান্য রসুনের গন্ধ থাকে। কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় আর্সেনিকের কোনো বর্ণ, গন্ধ বা স্বাদ থাকেনা।

আর্সেনিকদূষণ

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী খাওয়ার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা হলো প্রতি লিটারে ০.০১ মিলিগ্রাম। বাংলাদেশের জন্য আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা ধরা হয়েছে ০.০৫ মিলিগ্রাম। প্রত্যেক দেশ নিজ নিজ দেশের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ করে থাকে। আর্সেনিক যখন নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি হয় তখন তাকে আর্সেনিকদূষণ বলে। বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মতের একটি হচ্ছে পানিতে আর্সেনিকদূষণের প্রধান কারণ অধিক মাত্রায় ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন। প্রাকৃতিকভাবে আর্সেনিক আকরিক হিসেবে অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং তা বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে মুক্ত হয়ে পানিতে মিশে যায়। অতিমাত্রায় ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। যার ফলে মাটির কণার ক্ষুদ্র গহ্বরগুলোতে যে ফাঁকা স্থানের সৃষ্টি হচ্ছে সেই ফাঁকা স্থানকে দখল করছে বায়ু। বায়ু প্রবেশের ফলে ওই স্তরে সঞ্চিত আর্সেনোপাইরাইট এবং আর্সেনিক যুক্ত পাইরাইট বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে আর্সেনিককে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে মিশিয়ে দিচ্ছে। আরেকটি মত হচ্ছে, শিল্প-কারখানাগুলোর বর্জ্য পদার্থের মাঝে আর্সেনিক আছে এবং আমাদের দেশে নদীতে ওই বর্জ্য নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে। ফলে ওই পানির মাধ্যমেও আর্সেনিকের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

খরা

খরা একটি মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে খরা অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদনের পরিমাণ বৃষ্টিপাতের চাইতে বেশি হলেই এমনটি ঘটে। জনসংখ্যার চাপে বাছ-বিচারবিহীন উন্নয়ন প্রক্রিয়া, বৃক্ষ নিধন এবং বায়ুদূষণের ফলে বায়ুমন্ডল ক্রমশ রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে উঠছে। এতে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে গেছে, যা খরার মূল কারণ। ব্রিটিশ আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিসরে ধারাবাহিকভাবে বৃষ্টিপাত শূণ্যতাকে খরার মানদন্ড হিসেবে ধরেন। সাম্প্রতিককালে স্পারসোর একজন বিজ্ঞানী বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার জন্য দায়ী করেছেন পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মেরু অঞ্চলে সৃষ্ট এলনিনোকে (El-Nino)। উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মোটামুটি প্রতি দুই বছর পরপর খরা দ্বারা আক্রান্ত হয়। এজন্য আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা উত্তরাঞ্চলে মরু প্রক্রিয়া বিস্তারের আশঙ্কা করছেন। খরা পীড়িত অঞ্চল তপ্ত হয়ে ওঠে এবং কুয়া, খাল, বিল শুকিয়ে যাওয়ায় ব্যবহার্য পানির অভাব ঘটে। নদী প্রবাহ হ্রাস পায়, ভূগর্ভস্থ জল স্তর নিচে নেমে যায় ও মাটির আর্দ্রতায় ঘাটতি দেখা দেয়, ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে শস্য বিপর্যয় ঘটে এবং গবাদি পশুর খাদ্য সংকট দেখা দেয়। খাবার পানি, চাষাবাদ ও পশু পালনের ক্ষেত্রে সরাসরি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য খরা একটি বড় সমস্যা।

খাপ খাইয়ে নেয়া

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় খাপ খাইয়ে নেয়া বা Coping হলো ধারা বা রীতি যেখানে মানুষ সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল অর্জন করে। ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকার মানুষ ঘর তৈরির সময়ই চালের সঙ্গে 'টানা' বেঁধে রাখে, যাতে বাতাসে ঘরের চাল উড়িয়ে নিতে না পারে। নিচু অঞ্চলের মানুষ ঘর তৈরির ক্ষেত্রে সব সময় আগে ভিটা উঁচু করে থাকে। ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার ঘরবাড়ি বা স্কুল গৃহের ধরণ অন্য এলাকা থেকে খানিকটা ভিন্ন। দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে যারা বংশ পরম্পরায় টিকে থাকেন তারা

নিজেরাই খুঁজে বের করেছেন দুর্যোগের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আগাম সতর্ক করবার পদ্ধতি এবং ক্ষয়ক্ষতি কমাবার কৌশল। বংশ পরম্পরায় মানুষ তা মেনে চলে।

গ্রিনহাউস গ্যাস

বিভিন্ন গ্যাস দিয়ে তৈরি পৃথিবীর এ বায়ুমন্ডল। তার মূল উপাদান নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। এগুলো ছাড়াও নগণ্য পরিমাণে কার্বনডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড আছে। আরও আছে জলীয় বাষ্প ও ওজোন। বায়ুমন্ডলের গৌণ গ্যাসগুলোই গ্রিনহাউস গ্যাস। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট গ্যাস ছাড়াও মনুষ্য সৃষ্ট সিএফসি, এইচসিএফসি, হ্যালোজেন ইত্যাদি গ্যাসও বায়ুমন্ডলে যুক্ত হয়েছে।

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া

শীত প্রধান দেশে সাধারণত এক ধরণের স্বচ্ছ কাঁচের ঘরে তরি-তরকারি ও শাক-সব্জির চাষ করা হয়। ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে এসব ঘরের আবহাওয়া প্রয়োজন অনুযায়ী গরম রাখা হয়। এসব ঘরকেই বলে গ্রিনহাউস। সূর্যের আলো ও তাপ কাঁচের মধ্য দিয়েই ঘরে প্রবেশ করে কিন্তু বিকিরণের সময় সমুদয় তাপ বের হয়ে আসতে পারেনা। ফলে বাইরের তুলনায় ঘরের ভেতরে উষ্ণতা অধিক বজায় থাকে। সূর্যের আলো ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে তোলে। বিকিরণ প্রক্রিয়ায় এই তাপ আবার উর্ধাকাশে ফিরে যেতে চায়। এই বিকিরিত তাপের কিছু অংশ বায়ুমন্ডলে থেকে যায়। যার ফলে বায়ুমন্ডল তথা ভূ-পৃষ্ঠ উষ্ণ থাকে এবং জীবনের বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এভাবে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে। বায়ুমন্ডলে বিদ্যমান নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ছাড়াও নগণ্য পরিমাণে অন্যান্য গ্যাস আছে। এ ধরণের গ্যাসগুলো হচ্ছে কার্বনডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, ওজোন ইত্যাদি। এসব গ্যাসই এ ধরণের তাপ ধরে রাখে। বিগত ২০০ বছরে শিল্প বিপ্লব-উত্তর কালে মানুষের কর্মকান্ডের ফলে বায়ুমন্ডলের গ্যাসগুলোর অনুপাত পরিবর্তিত হয়েছে। একারণে বাতাসের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়ুমন্ডলে এসব গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে বলে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে বা তাপমাত্রার তীব্রতা বেড়ে যাচ্ছে।

ঘূর্ণিঝড়

প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড় হলো গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় বা বায়ুমন্ডলীয় একটি উত্তাল অবস্থা, যা বাতাসের প্রচন্ড ঘূর্ণায়মান গতির ফলে সৃষ্টি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ (Cyclone) গ্রিক শব্দ 'কাইক্লোস' (kyk-los) থেকে এসেছে। কাইক্লোস শব্দের অর্থ কুন্ডলী পাকানো সাপ। স্থানীয় ভাষায় ঘূর্ণিঝড়কে তুফান বলা হয়। অত্যধিক গরম ও তীব্র রোদের কারণে কোনো স্থানের বাতাস হালকা হয়ে ওপরে উঠে গেলে ওই স্থানে বাতাসের চাপ কমে ফাঁকা হয়ে যায় আর সেই ফাঁকা জায়গা দখল করতে তীব্র বেগে চারদিক থেকে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে আসা ভারি বাতাস ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় গভীর সমুদ্রে আর তার জন্য দরকার সমুদ্রের ২৭ ডিগ্রি সে. বা তার চেয়েও বেশি তাপমাত্রা। যে সকল সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সে. কম সে সকল সমুদ্রে খুব একটা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে দেখা যায়না। বাংলাদেশে সাধারণত বর্ষা মৌসুমের আগে ও পরে উষ্ণতার কারণে সাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। আর নিম্নচাপ থেকেই ঘূর্ণিঝড়ের জন্ম হয়।

জলবায়ু

ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থানের দীর্ঘ সময়ের দৈনন্দিন আবহাওয়ার সাধারণ বা গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে। জলবায়ুর উপাদানসমূহ হলো তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ু, মেঘ, বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, বায়ুচাপ ইত্যাদি। একটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক অবস্থা সে দেশের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কোনো স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘকালের (৩০ বছর বা তারও বেশি সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ুমন্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর যে সাধারণ অবস্থা দেখা যায়, তাকে ওই স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে।

জরুরি অবস্থা

এটি এমন এক পরিস্থিতি, যা মোকাবেলায় জরুরি হস্তক্ষেপ বা জরুরি সহায়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জরুরি অবস্থা ধনীদের তুলনায় দরিদ্র মানুষকে বেশি প্রভাবিত করে এবং এর ফলে অনেক মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে। যখন স্থানীয় মোকাবেলা কৌশল ভেঙে পড়ে বা আক্রান্ত মানুষের সামর্থ্যের অভাব দেখা দেয় তখনই জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

জরুরি সাড়া

আপদের চিহ্নিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করতে আমরা সকল প্রচেষ্টা নেওয়ার পরও অনেক সময় দুর্যোগ এড়ানো সম্ভব হয়না। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সময়ে তা বিবেচনায় নিয়ে জরুরি অবস্থা মোকাবেলার কার্যকর প্রস্তুতি থাকা এবং দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকর সহায়তা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা, জনগোষ্ঠী এবং ব্যবস্থাকে সচল রাখাই হলো দুর্যোগে জরুরি সাড়া।

জলোচ্ছ্বাস

যেখানে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় সেই ঘূর্ণিঝড়কেন্দ্র বা চক্ষু এলাকায় বাতাসের চাপ কম থাকে। ফলে ঘূর্ণিঝড়-কেন্দ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে সমুদ্রের পানি ফুলে উঠে, একেই জলোচ্ছ্বাস বলে। ঝড়ে সমুদ্রের বুকে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পেয়ে সমুদ্র উপকূলে আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ের তীব্র বাতাসে সৃষ্ট সমুদ্রের ঢেউ স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে অনেক বেশি হয়। আর তা যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমার সময় হয়, তাহলে এ জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা আরও অনেক বেশি হয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ের ঢেউ ৪৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে দেখা গেছে।

জোয়ার-ভাটা

চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের প্রভাবে প্রতিদিন দুইবার সমুদ্রের পানি নিয়মিত ও পর্যায়ক্রমে উঠানামা করে। সমুদ্রের পানির নিয়মিত ফুলে উঠাকে জোয়ার বলে এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে। গভীর সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার মধ্যবর্তী উচ্চতার ব্যবধান ২ ফুটের বেশি নয়। কিন্তু অগভীর এলাকায় এই উচ্চতা ২০ ফুটেরও বেশি হতে পারে।

ঝুঁকি

কোনো আপদ বা আপদসমূহ, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয়, সম্পদ এবং পরিবেশ– এই তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রণের ফলে (Interaction) ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভাবনাকে ঝুঁকি বলে। অর্থাৎ সহজে বললে কোনো আপদ ঘটার সম্ভাবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভাবনা এই দুইয়ের পারস্পরিকতাই ঝুঁকি।

ঝুঁকি = আপদ সম্ভাবনা x বিপদাপন্নতা

দুর্যোগ

দুর্যোগ হলো একটি মারাত্মক পরিস্থিতি যা প্রকৃতি বা মানব সৃষ্ট আপদের ফলে দেখা দেয়। এই পরিস্থিতি চলমান সমাজ জীবনকে গভীরভাবে ব্যাহত করে এবং মানুষ, সম্পদ ও পরিবেশের এত ক্ষতি সাধন করে যা মোকাবেলায় একটি সমাজকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি হয় তা শুধু নিজস্ব সম্পদ দিয়ে প্রায়ই পূরণ করা সম্ভব হয়না বরং বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সাধারণ অর্থে দুর্যোগ বলতে আপদ বোঝায় কিন্তু সব আপদই দুর্যোগ নয়। আপদ ও বিপদাপন্নতা এ দুটো উপাদান একত্র হলেই তাকে দুর্যোগ পরিস্থিতি বলা হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও সৃষ্ট পরিস্থিতি দুর্যোগ কিনা তা নির্ধারণ একটি সমাজের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে।

নিরাপদ পানি

যে পানিতে ক্ষতিকারক রোগ-জীবাণু নেই এবং অন্যান্য খনিজ উপাদান সহনীয় মাত্রায় থাকে, যদিও অনেক ক্ষেত্রে স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণযুক্ত হতে পারে তাকেই নিরাপদ পানি বলে।

পরিবেশ

কোনো একটি জীবের অস্তিত্ব বা বিকাশের ওপর ক্রিয়াশীল সামগ্রিক পারিপার্শ্বিকতা, যেমন– চারপাশের ভৌত অবস্থা, জলবায়ু ও প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য জীব ও জৈব উপাদানকে পরিবেশ (Environment) বলে। বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন পাস হয়েছে। কিন্তু জনবিস্ফোরণ, বনাঞ্চলের অবক্ষয় ও ঘাটতি এবং শিল্প ও পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবের দরুন দেশের পরিবেশ এক জটিল অবস্থার দিকে যাচ্ছে।

পূর্ব সতর্কতা

পূর্ব সতর্কতা হলো যেকোনো দুর্যোগ আঘাত হানার পূর্বেই ব্যক্তি বা জনগণের কাছে বার্তা প্রচার বা তথ্য প্রদান করা। পূর্ব সতর্কতায় সাধারণত আপদসমূহ, ঝুঁকি, ঝুঁকির উপাদান, পরিবেশ, বিপদের অস্তিত্ব এবং বিপদ প্রতিরোধ, বিপদ এড়াতে অথবা ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কী করা যায় সে সম্বন্ধে তথ্য প্রচার করা হয়ে থাকে।

প্রস্তুতি

প্রস্তুতি বলতে সেই সকল কাজের সমষ্টিকে বোঝায়, যা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাসে সহায়ক হয়। এ ধরণের কার্যক্রম দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান দুর্যোগের পূর্বেই গ্রহণ করে থাকে। প্রস্তুতি মূলক কার্যক্রমের মধ্যে আগাম সতর্কীকরণ, উদ্ধার ও স্থানান্তর পরিকল্পনা, সম্পদ সমাবেশ ও সংরক্ষণ, পারিবারিক প্রস্তুতি, সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন, দুর্যোগ প্রস্তুতি মহড়া, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা মূলক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য।

বন্যা/বান/প্লাবন

সাধারণভাবে বন্যা বলতে বোঝায় অস্বাভাবিক পানির প্রবাহ, যা প্লাবনমুক্ত ভূমিকে প্লাবিত করে এবং জান ও মালের ক্ষতি সাধন করে। জল বিজ্ঞানের মতে, "বন্যা হলো এমন একটি আপেক্ষিক উচ্চতা বা প্রবাহ, যা একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা বা প্রবাহকে অতিক্রম করে"। সিলেটের হাওর এলাকা বছরে ৪-৫ মাস পানিতে ডুবে থাকে, সেটাকে বন্যা বলা যাবেনা।

বিপদাপন্নতা

কোন জনগোষ্ঠীর (Community) বা তার কোনো অংশের (ব্যক্তি বা পরিবার) এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট আপদ দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা এবং ঐ আপদ সংঘটনের ফলে আক্রান্ত সমাজ ও ব্যক্তির জীবন যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রাকে বিপদাপন্নতা বলা হয়।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। এই উষ্ণতা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। ইতোমধ্যে অনেক দেশ এবং এর জনগণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের আবহাওয়ার ধরণ এবং ঋতুবৈচিত্র্য পাল্টে দিচ্ছে। এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি ঘটার সম্ভাবনা ও ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এইসব দুর্যোগে শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটছে এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদহানি হচ্ছে যার প্রভাব পড়ছে লাখ লাখ মানুষের জীবিকার উপর। গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে গত শতাব্দীতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ২৫%, নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ ১৯% এবং মিথেনের পরিমাণ ১০০% বেড়েছে (চতুর্থ সমীক্ষাপত্র, আইপিসিসি) যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অন্যতম প্রধান কারণ।

ভূমিকম্প

ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো কোনো অংশে আকস্মিক কম্পনের সৃষ্টি হলে তাকে ভূমিকম্প বা Earthquake বলে। ভূ-অভ্যন্তরস্থ শিলার স্থিতিস্থাপক ভারসাম্য নষ্ট হলে ভূত্বকের বিচ্যুতির মাধ্যমে নিঃসরিত স্থিতি বিনষ্টকারী শক্তির দ্বারা এই কম্পনের উৎপত্তি হয়। এরূপ কম্পন প্রচন্ড, মাঝারি বা মৃদু আকারের হতে পারে। পৃথিবীতে গড়ে বছরে প্রায় ছয় হাজার ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। অবশ্য এর বেশির ভাগই মৃদু আকারের হয় বিধায় সাধারণভাবে তা অনুভূত হয়না।

লবণাক্ততা

জমিতে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা সকল প্রকার ভূমি অবনমনকে লবণাক্ততা বলে। সীমিত অর্থে, জমিতে মুক্ত লবণ সঞ্চয়ন ও সডিফিকেশনকে (যাকে ক্ষারীয়করণও বলা হয়ে থাকে) অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সডিফিকেশন হলো বিনিময় কমপ্লেক্সে সোডিয়ামের প্রাধান্য ঘটা। অত্যধিক পরিমাণে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে ও সমুদ্রের লবণাক্ত পানির উপকূলীয় মৃত্তিকাতে অনুপ্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে লবণাক্ততার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে লবণাক্ততার ফলে সৃষ্ট ভূমি অবনমন অন্যতম প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

সমুদ্র পৃষ্ঠ

সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার মাঝামাঝি তল বা উচ্চতা, যা কোনো স্থানের ভূমি উত্থান এবং মহাসাগরীয় গভীরতা পরিমাপক নির্দেশক রেখা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাকে সমুদ্র পৃষ্ঠ বলে। তাত্ত্বিকভাবে ধরে নেয়া যায় যে, সমুদ্র পৃষ্ঠ স্থির এবং মহাদেশের দিকে মুখ করে অবস্থিত স্থায়ী আনুভূমিক একটা পৃষ্ঠ। কিন্তু বিভিন্ন উপাদানের ক্রিয়াকলাপের ফলাফলে সমুদ্র পৃষ্ঠ স্থানভেদে কয়েক মিটার পর্যন্ত কম বেশি হতে পারে। জোয়ার-ভাটার উঠা নামা, জলরাশির তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন, উর্ধ্ব-নিঃসরণ, নদ-নদীর সরবরাহের পরিবর্তন প্রভৃতির প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে থাকে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে বিশ্ব জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, তথা নিম্ন উচ্চতা বিশিষ্ট ব-দ্বীপ অঞ্চলসমূহ প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা উপকূলে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশও ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের তালিকার অন্তর্ভূক্ত। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্লাবন মাত্রায় ২০৫০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা, ভূমি ব্যবহার এবং জাতীয় আয়ে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের ১৪৪-২০৯ সে.মি. উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে প্রায় ১৬-১৮% বাসযোগ্য ভূমি প্লাবিত হওয়া এবং বর্তমান মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৩-১৫% ও মোট জাতীয় আয়ের (জিডিপি) প্রায় ১৩% পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সামর্থ্য

সামর্থ্য হচ্ছে সত্যিকার অথবা কাল্পনিক কোন দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক উপায়ে সাড়া দেবার সার্বিক সক্ষমতা। অর্থনৈতিক, জ্ঞান ও দক্ষতা, সামাজিক সম্পর্ক, কারিগরি সক্ষমতা ও ভৌত সম্পদের অভিগম্যতা সবগুলোর মিলিত রূপই সার্বিক সক্ষমতা।

স্বাস্থ্যবিধি চর্চা

সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ জীবন রক্ষা করার জন্য জনগোষ্ঠী কর্তৃক নিরূপিত ও মেনে চলা কার্যবিধিসমূহকে স্বাস্থবিধি বলা হয়। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধিচর্চার একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি সৃষ্টি করেছে, যার গ্রহণযোগ্যতা জাতি, সংস্কৃতি, লিঙ্গ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে।

স্যানিটেশন

স্যানিটেশন বলতে মূলত মানবদেহের বিভিন্ন বর্জ্যসমূহ, বিশেষত মল-মূত্র স্বাস্থ্যসম্মতভাবে নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ও নিরাপদ বন্দোবস্ত বা ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়। বিশ্বজুড়ে অপ্রতুল স্যানিটেশন ব্যবস্থা রোগ-ব্যধি

ছড়ানোর একটি অন্যতম কারণ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতকরণ করা হলে তা পারিবারিক ও জনস্বাস্থ্যের ওপর লক্ষণীয় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এছাড়াও ময়লা, আবর্জনা ও বর্জ্য পদার্থ সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে নিষ্কাশনের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্যবিধিচর্চা করাও স্যানিটেশন এর আওতাভূক্ত।

গ্রন্থপঞ্জী

Ahmed, S. (2008), An Assessment of the Impacts of Floods on Sanitation in Rural Bangladesh, BRAC

DER (2007), Bangladesh Flood 2007 DER Post Disaster Needs Assessment Summary Report

DMB (2010), National Plan for Disaster Management 2010-2015

DMB, Past Disaster Information http://www.dmb.gov.bd/

ECB (2011), Flooding & Prolonged Water-logging in South West Bangladesh Coordinated Assessment Report

ISDR, Terminology, Basic terms of disaster risk reduction

Local Government Division (1998), National Policy for Safe Water Supply & Sanitation; MoLGRD&C, Government of Bangladesh.

Local Government Division (2005), National Sanitation Strategy; Ministry of MoLGRD&C, GoB

Mehedi, H., Nag, A. K., & Farhana, S. (2010) Climate Induced Displacement Case Study of Cyclone Aila in the Southwest Coastal Region of Bangladesh. Humanitywatch. Khulna.

MoEF (2009), Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, Government of Bangladesh

MoEF (2009), National Adaptation Programme of Action (NAPA), Government of Bangladesh

MoFDM (2010), Standing Order on Disaster, Government of Bangladesh

Ministry of Water Resources (2012), Master Plan of Haor Areas, Government of Bangladesh

NIRAPAD (2010), World Vision Training Handout Session

The Listen First Framework: http://www.listenfirst.org/materials; Handout, ALNAP Training - Leadership in Action

UNDP (2010), Cyclone Aila Joint UN Multisector Assessment & Response Framework

UNICEF ROSA (2008), Behaviour Change Communication In emergencies: A Toolkit

WaterAid, Technology notes, www.wateraid.org

WEDC, WHO (2011), Technical Notes on Drinking-Water, Sanitation and Hygiene in Emergencies

এশিয়াটিক সোসাইটি (২০০৬), বাংলাপিডিয়া

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, http://www.dphe.gov.bd

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (২০০৫), উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পান্থ রহমান (২০১০), চ্যানেল আই, সাংবাদিকের দিনলিপিতে ‘আইলা কষ্ট!’; সাংবাদিকের সাক্ষ্য- আইলাদুর্গত মানুষের এক বছরের জীবন-যন্ত্রণা

সিডিএমপি (২০০৯), দুর্যোগকোষ

স্ফিয়ার প্রজেক্ট (২০১১), মানবিকতার ঘোষণাপত্র ও দুর্যোগে সাড়া দেয়ার ন্যূনতম মান

শামীম আল আমীন (২০১০), বিশেষ প্রতিনিধি, চ্যানেল ওয়ান; ‘ঝড় থেমেছে কান্না থামেনি’; সাংবাদিকের সাক্ষ্য- আইলাদুর্গত মানুষের এক বছরের জীবন-যন্ত্রণা

বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা (অক্টোবর ১৫, ২০০৯), দ্বিতীয় তফসিল, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী

আরো তথ্যের জন্য নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

ওয়াটারএইড ইন বাংলাদেশ
বাড়ি# ৯৭/ বি, রোড# ২৫
ব্লক- এ, বনানী, ঢাকা ১২১৩, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮০ ২ ৮৮১৫৭৫৭
ইমেইল: info@wateraidbd.org
www.wateraid.org/bangladesh

নিরাপদ
১৯/১৩ (নিচতলা), বাবর রোড, ব্লক- বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮০ ২ ৮১৪৩৭২৯
ইমেইল: nirapad@nirapad.org
www.nirapad.org

রূপান্তর RUPANTAR

সুশীলন Shushilan

UST Unnayan Shahojogy Team